দিদি গুরুপ্রিয়া

শ্রদ্ধার্ঘ্য

দিদি গুরুপ্রিয়া

"শ্রদ্ধার্ঘ্য"

প্রকাশক :
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ
ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১০০১

প্রথম প্রকাশ :
শুভ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব
মাঘী পূর্ণিমা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

মূল্য :
পচিশ টাকা

মুদ্রক :
অনুপ প্রিন্টার্স
রামাপুরা, বারাণসী
ফোন : ৩৯২১৭৯

নিবেদন

পরম শ্রদ্ধেয়া দিদি গুরুপ্রিয়ার জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব শুভারম্ভে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি।

আশৈশব নিজ জীবনে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কর্ম্মযোগ প্রতিপাদনের জন্যই তাঁহার জন্ম। পিতা মাতার সেবা এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা স্বত্ত্বেও তিনি নিজের ভিতরে সর্ব্বদা কি যে এক অপূর্ণতা, কি এক অভাব বোধ করিতেন। সেই অভাব বোধের পরিসমাপ্তি হইল প্রথম মাতৃদর্শনে। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন মাত্র তিনি অভিভূত হইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমার স্বত:স্ফূরিত উক্তি — "এতদিন কোথায় ছিলে?" প্রথম দিন হইতেই শ্রীশ্রীমার সহিত তাঁহার অভূতপূর্ব সাহচর্য্য একপ্রকার অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান ছিল।

শ্রদ্ধেয়া দিদি ছিলেন শ্রীশ্রী মায়ের লীলা সঙ্গিনী। তিনি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে সংসারের পথে ক্লান্ত মানবকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া চিরশান্তির সন্ধান দিবার জন্যই শ্রীশ্রীমা মাতৃমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ সঙ্গলাভের যে সৌভাগ্য তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই পরম সম্পদেরই অংশ ভক্ত সমুদায়কে "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার নিকট

সেই কারণে অশেষ ঋণী।

দিদি গুরুপ্রিয়ার অতুলনীয় কর্ম্মশক্তি ও গঠনমূলক ক্ষমতার অদ্বিতীয় নিদর্শন "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ।" তাঁহারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম সমূহ। বারাণসী স্থিত "মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়" ও তাঁহার অন্যতম অবদান।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে দিদি গুরুপ্রিয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের যে দীপবর্ত্তিকা জ্বালাইয়া দিয়াছেন তাহা দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িবে এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নি:সন্দেহ।

পরম শ্রদ্ধেয়া দিদির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে "শ্রদ্ধার্ঘ্য" অর্পণ করা হইতেছে তাহা তাঁহারই বিশেষ গুণমুগ্ধ কয়েকজনের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের বিনম্র প্রচেষ্ঠা। সময়াভাব বশত: অনেকেরই সংস্মরণ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর হয় নাই সেজন্য আমরা আন্তরিক দু:খিত।

—বিনীত
প্রকাশক

সূচী - পত্র

"দেখ, প্রথম দিন যখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, আমি বলিয়াছিলাম, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তারপর এই যে সকলেই প্রায় বলে, আমার তোমার চেহারায় মিল আছে, অনেকে মনে করে তুমি আমার ছোট বোন, এই সব কথার কি কোন অর্থ নাই মনে কর? এসব কথার অর্থ আছে।"

—শ্রীশ্রী মা

দিদি গুরুপ্রিয়া

দিদি

(শ্রীশ্রী মায়ের জন্মদিনে)

—ব্রহ্মচারী শৈলেশ

আমার মানস কল্পনা চোখে
ভেসে আসে ছবি খান্নার থেকে,
মায়ের জন্ম দিবসেতে দিদি
জন অরণ্য মাঝারে।

চন্দন তাঁর ললাটে লিপ্ত,
স্নিগ্ধ গৌর বরণ-দীপ্ত,
স্নেহ সুশীতল নয়নের জ্যোতি
ঝরিয়া পড়িছে অঝোরে।

অন্তরে তাঁর পুলক পুঞ্জ,
শান্তির গেহ নিভৃত কুঞ্জ,
বদনের পরে উঠিছে ঝলকি
প্রফুল্লতার আভাসে।
অঙ্গে শোভিছে রঙ্গীন বসন
ব্রহ্মচারিণী, মিত আভরণ
পুলকিত তনু পবিত্র মন
সবারে তুষিছে সুহাসে।

দিদি গুরুপ্রিয়া

যখন প্রভাতে মেলেনি নয়ন
পাখি কলরবে কুঞ্জ কানন
মুখরিত হয়ে ওঠেনি তখন
দিদি নামিয়াছে কাজে।

সবারে ডাকিছে "ওরে উঠে আয়"
"দেখ্ শুভ দিন ঐ পশে প্রায়
পূরব আকাশে আলোকের বাঁশী
ঐ শোন ঐ বাজে।"

ধীরে জাগে ঊষা স্নিগ্ধ প্রভায়
কর্ম সাগরে দিদি ডুবে যায়
চির চঞ্চল অতল অধীর
নিঃশ্বাস ফেলা ভার;

বিভিন্ন ধারা জনতা সংঘ
আসিছে ছুটিয়া মহা আসংগ
মহারাজ হতে দীন অতি দীন
ভেদাভেদ নাহি তার।

সে সবারে দিদি একা একা তোষি
পরম আদরে সম্মানে পোষি
যত্নে বসায়ে মনে মনে কষি
অন্য হিসাব আর।

দিদি

কে আসিল আর কেবা না আসিল
মা'র উঠিবার সময় কি হ'ল
জন্ম দিবসের বার্ত্তার চিঠি
এখনও গেলনা কার ?

ওদিকে মায়ের পূজা আয়োজন
হ'ল কি না হ'ল মায়ের ভবনে
এখনও মুখর কীর্ত্তন-গানে
হ'ল না কেমন ধারা;

এইরূপ কত লক্ষ ও শত
কর্মের পিছে দিদি অবিরত
ছুটিয়া চলিছে বিরাম-বিহীন
শ্রান্তি ক্লান্তি হারা।

অজস্র কাজে বিরাম-ছিন্ন
যদিও রাখে না কিছুই চিহ্ন
নিশি দিনমান শতধা ভিন্ন
কর্ম সাগরে সাঁতারে,

নাহি তাহে খেদ নাহি তাহে দুখ
অকাতরে ত্যজে জীবনের সুখ
একটি লক্ষ্যে ছুটিয়া চলেছে
নিশি দিনমান ধরে।

দিদি গুরুপ্রিয়া

"ধরায় জীবন নহে ত নিত্য"
জীবনে জাগায় পরম এ সত্য
দূরে দিছে ফেলে খ্যাতি ও বিত্ত
ধন-জন-মান আর।

যে দেখেছে তাঁরে, সেই তাহা জানে
সেবা কারে কহে, করে সে কেমনে
শ্রেষ্ঠ সেবিকা দিদির জীবনে
ফুটিয়াছে অভিনব।

নিত্য বিপুল বিরাট জনতা
আসে মা'র কাছে কত না বারতা
কত হাসিমাখা, কত দুখ কথা
নিত্য ঢালিতে চরণে।

কিন্তু বারেক ভেবেছে কি তারা
নিত্য যে চলে এ কাজের ধারা
কেমনে চলিছে কাহার গোপন
হস্ত পরশ পিছনে?

কখনও তিক্ত কখনও মিষ্ট
কভু মঙ্গল কভু অনিষ্ট
সুখ-দু:খের চক্রের মাঝে
দিদি ঠিক আছে আড়ালে।

দিদি

কতই শুনেছি, দেখেছি ও সব
প্রয়োজন-হীন বৃথা কলরব,
আমি জানি শুধু কর্ম ও সেবা
মিলিয়া এ ধরা পরে,

"দিদি" রূপ ল'য়ে আসিয়াছে নামি
ধন্য আমরা ধন্য ধরণী,
তবু পরিচয় যদি কেহ চায়
কহি শুধু তার তরে,

"দিদি" হ'ন তিনি মোদের সবার,
'গুরুপ্রিয়া দেবী' কহে কেহ আর,
"দাদাভাই" নামও শুনেছি তাঁহার,
মা'র মুখে শুনি "খুকুনী"।

আজকে মায়ের জন্ম দিবসে
তাঁহার চরণে প্রণমি।

দিদি গুরুপ্রিয়া স্মরণে

—ব্রহ্মচারিণী চন্দন

অপরূপা এক মাতৃমূর্তি ঢাকার শাহবাগে বিরাজ করছেন। মহাভাবে তিনি সদাই বিভোর হয়ে রয়েছেন। পরিধানে তাঁর লাল পাড় শাড়ী। স্বল্প অবগুণ্ঠনে আবৃত মুখে অসাধারণ জ্যোতি। আঁখি দুটি অর্ধনীমিলিত। কপালে বড় সিঁদূরের ফোঁটা জ্বল জ্বল করছে। কথা অস্পষ্ট, জড়ান—যেন কোন জ্যোতির্লোকের অধিবাসিনী ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এই পরমা জননীর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছেন আর এক মহীয়সী নারী। যেন তাঁর কত পরিচিতা, কত আপন জন। শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা আপনিই লুটিয়ে পড়ল মায়ের ঐ রাঙ্গা চরণে। কেটে গেল লজ্জা ভয়; খুলে গেল হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার।

শাহবাগের ঐ মা'ই হলেন বিশ্ববরেণ্যা শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী। আর যিনি দর্শনে ধন্য হলেন তিনি মাতৃগত প্রাণা শ্রদ্ধেয়া দিদি গুরুপ্রিয়া। প্রথম দর্শনেই সমর্পিত হল জীবন। বরণ হল মায়ের চরণ হৃদয় মাঝে জীবনের একমাত্র অবলম্বন রূপে।

দিদি গুরুপ্রিয়া বাংলা ১৩০৫ সনের ৩০শে মাঘ, (ইংরাজী ১৮৯৯, ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি) আসামের শিলচর

শহরে জন্ম লাভ করেন। পিতা প্রখ্যাত সিভিল সার্জন শ্রী শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায়। আশ্রিত জনের প্রতি দয়া তাঁর সহজাত গুণ ছিল। ধর্মপ্রাণ, উদারচেতা, অতিশয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন তিনি। অসহায় আত্মীয় স্বজনের আশ্রয় দাতা রূপে খ্যাতি ছিল তাঁর। মাতা হরকামিনী দেবীও পতিপরায়ণা, রূপে রূপবতী, গুণে গুণবতী, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী ও তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্না ছিলেন। সতত কর্ত্তব্য পরায়ণতার জন্য পরিবারের সকলেরই প্রিয় ছিলেন তিনি। পিতা মাতা ঘর আলো করা এই শিশু কন্যার নাম রাখলেন 'আদরিণী'। তাঁদের যে অতি আদরের ধন এই কন্যা। তারই স্মৃতি জড়িয়ে রইল এই নামে। আদরিণী কন্যাকে কোলে পেয়ে পিতা মাতা হৃদয়ের অগাধ স্নেহ উজার করে কন্যার লালন পালন করতে লাগলেন। আদরে লালিতা পালিতা আদরিণীও হয়ে উঠলেন বড়দের কাছে 'বড়খুকী' ও ছোটদের কাছে 'বড়দি'। পরম আদরে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিলেন কন্যা। বিদ্যালয়ে ছাত্রী রূপেও সকলের আদরের। একবার যা পড়তেন বা শুনতেন তা কখনও ভুলতেন না। অধ্যয়নের সঙ্গে মননও চলত তখন হতেই, যা পরবর্ত্তী জীবনেও দেখা গেছে। দিদির এই মেধা এবং স্মৃতি শক্তির পরিস্ফুরণ সমগ্র জীবন ব্যাপী বিদ্যমান ছিল।

একাদশবর্ষীয়া আদরিণীর শাস্ত্রীয় বিধি মত বিবাহ হল শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিবাহে অনিচ্ছা

সত্ত্বেও পিতা-মাতার আদেশ পালনের জন্যই যেন বিবাহ সূত্রে বন্ধন স্বীকার করলেন। নব বধূরূপে আদরিণী প্রবেশ করলেন গৃহস্থাশ্রমে। কিন্তু শ্বশুর গৃহে এসে অবাধ আদরিণীর স্নান, আহার বন্ধ। কারো সঙ্গে কথা বলেন না, কোনো দিকে তাকান না। বসে আছেন তো বসেই আছেন, অনড় অটলভাব। নববধূর এরূপ অবস্থায় ভীত শ্বশুর পরিবার পিতাকে টেলিগ্রাম করে সমস্ত জানালেন। খবর পেয়ে বড় ভাই গিয়ে পিত্রালয়ে নিয়ে এলেন, আদরিণী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সংসার জীবনের কঠিন শৃঙ্খল মুক্ত আদরিণী পিতৃ গৃহে সানন্দে পিতামাতার সেবা গ্রহণ করলেন। পিতৃ গৃহে মহাসুখে আছেন। পাড়া প্রতিবেশী সমবয়স্কা সঙ্গিনীরা, সহপাঠিনী, গুরুজন অনেকেই আদরিণীকে বোঝালেন পতি গৃহে যাবার জন্য। আদরিণী নিজের সিদ্ধান্তে অটল। সঙ্গিনীদের কথার তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন — "তোমরা যেমন ভাবতে পার না কুমারী জীবন, আমিও তেমনি ভাবতে পারি না, যে পিতা মাতা জন্ম দিলেন, পৃথিবীর আলো দেখালেন, আদরে লালন-পালন আর শিক্ষা দিলেন, তাঁদের ছেড়ে তোমরা কেমন করে এক অজানা, অচেনা, অদেখা, পুরুষটিকে জীবন সঙ্গী করে আনন্দ পাও। নিজ পিতা মাতাকে ছেড়ে চলে যাও।" এমন করে ইতি পূর্বে কেউ তো ভাবে নি, কেউ তো বলেনি। আশ্চর্য্য হয়ে সকলে নিরস্ত হলেন। আদরিণীর সাধন পথের সকল বাধা বিপত্তি কেটে গেল। বিধির বিধানে যে জীবন মাতৃ

পূজায় উৎসর্গিত তা কেমন করে তুচ্ছ সসীম সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কিছুদিন পর যখন পতিকে ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন উঠল — আদরিণী নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, "যাঁকে গ্রহণই হয়নি তাঁকে আবার ছাড়ার প্রশ্ন কোথায়?" উত্তর শুনে সকলে হতবাক্ ও মুগ্ধ হলেন।

পিতৃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আদরিণীর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি মাতা পিতার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। অবসর সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সদ্গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে স্বাধ্যায় চলতে লাগল। এ ছাড়াও দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্যচর্চা প্রভৃতিতেও আদরিণীর সমান আগ্রহ প্রকাশ পেল। এভাবে আধ্যাত্মিক জগতে অনুপ্রবেশ এবং শাস্ত্র সম্মত ধর্মময় জীবনের পরিস্ফুরণ প্রথম হতেই আদরিণীর জীবনে স্বাভাবিকভাবে ঘটে গেল।

এমনই সময়ে মাতা হরকামিনী দেবী গত হলেন। সংসারের সকল দায়দায়িত্ব এসে পড়ল। সকল কার্য্য নিপুণভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে লাগল। কিন্তু গৃহের সর্বত্রই মায়ের স্মৃতি। যেদিকে তাকান, মায়ের স্নেহ-আদরের অভাব যেন তাঁর চিত্তকে ব্যথিত করে তুলল। মাতৃ হারা জীবন যেন বিস্বাদ লাগে, কিছুই ভাল লাগে না। সংসারে আর কোনরূপ আকর্ষণ নেই। এ যেন সর্ব ত্যাগিনীর তপস্বিনীর অদ্ভুত অবস্থা। অন্তরের অন্ত:স্থলে যেন কাকে

খুঁজে বেড়ান। গৃহে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, তবু কিসের যেন অভাব। ফলত: শান্তি পথের অনুসন্ধান পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় দিন যেন ফুরায় না। দেহ সংসারের কর্মের বন্ধনে ক্লান্ত, মন আকুলতা ব্যাকুলতায় ছিন্নভিন্ন, অন্তরে পূর্ণ বৈরাগ্য।

মনের এরূপ যখন অবস্থা সেই সময়ে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আদরিণীর রথীরিহীন জীবন রথের লাগামটি সুকৌশলে টেনে ধরলেন শ্রীশ্রী মা। একদিন পিতা শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় এসে বললেন যে, ঢাকা শাহবাগে নবাবদের বাগানে এক মাতাজী এসেছেন, তিনি তাঁর দর্শনে চলেছেন। আদরিণীর প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করতে না পারায় যাওয়া হল না। গাড়ী ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল। আদরিণী বারান্দায় দাঁড়িয়েই চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। কি আশ্চর্য্য! যাঁকে কোনোদিন দেখেন নি, যাঁর সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই তাঁর প্রতি কেন এত আকর্ষণ, কেনই বা এত কান্না! রাত্রে পিতা বাসায় ফিরলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে মায়ের সব কথা শুনলেন যে, মা স্বয়ংই তাঁকে নিয়ে যেতে বলেছেন, তখন কত আনন্দ! কত তৃপ্তি! মা ডেকেছেন। একরাত্রির ব্যবধানও যেন অসহ্য বোধ হতে লাগল। পরদিন মার দর্শনে শাহবাগে গেলেন।

সময়টা জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে, ১৯২৬

খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম দর্শনেই তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। এই দর্শনই তাঁর জীবনে এঁকে দিল এক সুবর্ণ রেখা। শ্রীশ্রী মাও চিনে নিলেন তাঁর নির্দিষ্ট লীলাসহচরীকে। কত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?" মা তখন ভাবাবিষ্টা। তার মধ্যেই হাসিহাসি মুখে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আদরিণী ভাবাবিষ্টা মাকে দেখছেন আর আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছেন, একটু স্থিরতা আনার জন্য মানুষকে কত সাধনা করতে হয়, কিন্তু এঁর তো দেখছি সর্বদাই ভাব লেগে আছে। আবার তার মধ্যেই সহজ-সরল স্বাভাবিক ব্যবহার করছেন। একই শরীরে একই সময়ে যেন দ্বৈতাদ্বৈতের এক বিস্ময়কর প্রকাশ। যতই দেখছেন ততই অবাক, আত্মহারা ও স্তব্ধ হয়ে পড়ছেন। ভাবময়ী মায়ের শরীরের একটু স্পর্শে, মায়ের মুখের মধুর কথায় ক্রমেই মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়ে পড়ছেন। পিতার আদেশে যথা সময়ে বাড়ী ফিরতে হল কিন্তু মন পড়ে রইল মায়ের কাছে। কখন রাত্রি শেষ হবে, কখন আবার মায়ের দর্শন পাবেন—এই ভাবনায় কেমন এক আবেশের মধ্য দিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাতে লাগলেন প্রত্যুষের অপেক্ষায়। সকাল হতেই আবার মাতৃদর্শনে যাওয়া, মাতৃ সঙ্গলাভ, মাতৃকথা শ্রবণ, মায়ের কাজে সহায়তা, দিনের শেষে বাসায় ফেরা। বাড়ীতেও যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ মায়েরই স্মরণ, চিন্তন-মনন হৃদয় জুড়ে সর্বদা মা-ই রয়েছেন। এভাবেই আসা-যাওয়া চলতে লাগল এবং ক্রমশ: মাতৃ সান্নিধ্যে সম্বন্ধ গাঢ় হতে গাঢ়তর

হতে লাগল।

শ্রীশ্রী মায়ের ভাবময় শরীর। সর্বদাই মহাভাবের মধ্যে আছেন। শরীর বোধ নাই। স্থান কাল বোধ নাই। প্রথম প্রথম মায়ের কাজে আদরিণীকে সহায়তা করতে হত। ধীরে ধীরে মায়ের শরীর সামলানোর কাজেও আদরিণী জড়িয়ে পড়লেন। অনন্তভাবময়ী মায়ের ভাবলীলার উপযুক্তা লীলাসঙ্গিনী রূপে আদরিণীর আত্মপ্রকাশ ঘটল মায়েরই খেয়ালে। এখন হতে শ্রীশ্রী মায়ের সকল প্রকার সুবিধা অসুবিধা, প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝে লীলাময়ীর শরীরের সেবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আদরিণীর মাতৃ আরাধনা। প্রথম দর্শনেই তো মায়ের জন্য ব্যাকুলতা ছিলই, এবার মাতৃপ্রেমে পাগলিনী নিজেকে সম্পূর্ণ মাতৃচরণে সমর্পণ করে দিলেন। শ্রীশ্রী মায়েরও নিত্যসঙ্গিনীকে পেয়ে লীলা প্রকাশ হতে থাকল। কত রকমের কত কথাই আদরিণীকে বলেন, যার অর্থবোঝার ক্ষমতা সকলের নাই, যাঁকে বলেন তিনিই বুঝতে পারেন। আদরিণীও বহু আকাঙ্ক্ষিত ধন লাভে আত্মবিস্মৃতা। এভাবে কখন মাময়ী হয়ে পড়েছেন নিজেই বুঝতে পারেন না, বুঝতে পারলেন না মাতৃপরিবারে 'দিদি'র স্থান অধিকার করে ফেলেছেন। মাতৃ ভক্তরা তাঁদের একান্ত আপনার জন অতি আদরের 'দিদি'কে পেয়ে ধন্য হলেন।

এই স্মৃতি কথায় এখন থেকে আদরিণীকে 'দিদি' বলেই সম্বোধন করব। যে দিদি গৃহে ছিলেন অত্যন্ত লাজুক

প্রকৃতির ও স্বল্পভাষী; সেই দিদি মাতৃ সন্নিধানে লজ্জা ত্যাগ করে হলেন মাতৃকথায় মুখর আর সেবায় তৎপর। কেবল মাতৃ কৃপায় নিজেকে উন্মুক্ত করে দেওয়া নয়, ভক্ত সেবায়ও এখন থেকে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিলেন। ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা; তাদের সুখ সুবিধা দেখা; সকলে প্রসাদ পেল কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখা; সকল কাজের ব্যবস্থাপনায় ভক্তদের সঙ্গে পরামর্শ করা —— এ সমস্ত দিদিরই দায়িত্ব। মায়ের সেবা, ভক্তগণের সেবা, সারাদিন দিদি কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। তবু শরীরে, মনে ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। আবার এরই মধ্যে দিদি মাকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী', 'দেবতার গ্রাস' প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের নায়িকা দেবী চৌধুরানীর গল্প শোনাতেন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করেও শোনাতেন। এ ছাড়া কত সুন্দর সুন্দর হাস্য রসের ছড়া দিদির ঝুলিতে ছিল ইয়ত্তা নাই। সর্বরসেশ্বরী শ্রীশ্রী মাও লীলাসঙ্গিনীর এই রসালাপে যোগ দিতেন। শ্রীশ্রী মা এসব শুনে খুব হাসতেন; কখনও সোৎসাহে প্রশ্ন করতেন এবং আরো শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন। দিদির তো মাকে আনন্দ দেওয়াই একান্ত কাম্য ছিল, কাজেই এ বিষয়ে দিদির ক্লান্তি দেখা যেত না। দিদির মধ্যে যেমন আধ্যাত্মিক দিকটির পরিস্ফুরণ ঘটেছিল তেমনিই সাহিত্যানুরাগ, হাস্যরসিকতা প্রভৃতি লৌকিক দিকগুলিও প্রকটিত ছিল।

এই আধ্যাত্মিকতা ও লৌকিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণ দিদির চরিত্রে দেখা যায়, যেগুলি মহাপুরুষের চরিত্রবৈশিষ্ট্য।

এভাবে একদিকে শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ সেবিকা, সখী, অন্তরঙ্গ সহচরী, আবার সচিব ও দেহরক্ষীরূপে, অন্যদিকে অগণিত ভক্তেরও সেবিকারূপে আদরিণীর 'গুরুপ্রিয়া দিদিতে' উত্তরণ — এক মহাতপস্বিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন গুরুর (শ্রীশ্রী মার) প্রতি অগাধ প্রেম ও ভক্তি তেমনিই ভক্তদের প্রতি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ ভালবাসা ও কর্ত্তৃত্ববোধ। তাই তিনি 'গুরুপ্রিয়া' এবং ভক্তদের বড়ই শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্রী 'দিদি'। শুধু তাই নয়, দিদি আরোও অনেক গুণের অধিকারিণী। তাঁর কর্মদক্ষতা, বুদ্ধি মত্তা, সাহিত্য-প্রতিভা, তৎপরতা, পরিশ্রম পরায়ণতা, উপস্থিত বুদ্ধি যা অনেক পুরুষ চরিত্রকেও ম্লান করে দেয়।

অগ্রজ শ্রী জিতেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ও দিদির লেখা চিঠি পত্র — তাঁর প্রশ্নে, তাঁর ভাব ও ভাষায় এবং লেখন শৈলী দেখে আশ্চর্য্যবোধ করতেন। এ সম্বন্ধে তাঁর কাছে শোনা গিয়েছে — "এখনও যখন ঐ সব চিঠি পত্র দেখি, মুগ্ধ হয়ে ভাবি, — কি এক অসাধারণ সহজাত প্রতিভা নিয়ে বড় খুকী জন্ম নিয়ে ছিল। স্কুল-কলেজে পড়লে ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার হবার যোগ্যতা ওর মধ্যে ছিল।" পাকা হাতের লেখা, উপস্থিত বুদ্ধিযুক্ত আচার-আচরণে অনেক

উচ্চশিক্ষিত অফিসারও মুগ্ধ হতেন আর বলতেন, "দিদি যদি উচ্চশিক্ষিতা হতেন, আমাদের কোনো স্থান থাকত না।" ভাই বোনের মধ্যেও এসব নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা চলত।

গুরুপ্রিয়াদিদির উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষা হল তারাপীঠে। বাংলা ১৩৪২ সনের ১৯শে মাঘ (ইংরাজী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারী) শ্রীশ্রী মার উপস্থিতিতে শাস্ত্রীয় বিধানে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হল। আচার্য্য গুরু ছিলেন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সে সময়ের নাম করা পণ্ডিত। দিদিকে শ্রীশ্রী মা দেরাদুনে হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র পরিধানের নির্দেশ দিয়ে গুরুপ্রিয়া নামকরণ করেছিলেন। সময়টা ১৩৪০ সনের মাঘ মাস।

স্বয়ং ভগবতী যেখানে আপন প্রিয় ভক্তের সাধনার সূত্রটি ধরে রাখেন সেখানে আধ্যাত্মিক জগতে নজির সৃষ্টি হয়। যুগে-যুগে অবতার লীলায় তা দেখা গেছে। দিদির ক্ষেত্রেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সুতরাং শ্রীশ্রী মায়ের লীলাময় জীবনের সঙ্গে দিদির জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই শ্রীশ্রী মায়ের কথা বাদ দিয়ে দিদির কথা বলা বাতুলতা মাত্র।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধি ক্ষণে গৌরবময় ভারত যখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ভারতবাসী যখন উচ্ছৃঙ্খল, কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, আপন হিন্দু ধর্মে নিষ্ঠা হারাতে বসেছে;

হারাতে বসেছে ঐতিহ্যময় হিন্দু আদর্শ ও মর্য্যাদা ঠিক এমনই সময়ে পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীতে আবির্ভূতা হলেন শ্রীশ্রী মা। যিনি জগতের আদি, যাঁর থেকে সকল সৃষ্টি প্রকাশিত, সেই অব্যক্ত শক্তি ব্যক্তরূপে ধরা দিলেন।

১৮৯৬ সনের মে মাসে বাংলা ১৩০৩, ১৯শে বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে যে দিব্যকন্যার দিব্যপ্রকাশ ঘটল — সেই কন্যাটি আজ বিশ্ববরেণ্যা বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মাতা আনন্দময়ী রূপে অগণিত ভক্ত হৃদয়ে আরাধিতা, সম্পূজিতা এবং সুপ্রতিষ্ঠিতা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী ঢাকায় এলেন ভোলানাথের সঙ্গে। সময়টা বাংলা ১৩৩০ সনের ২৮শে চৈত্র। ইংরাজী ১৯২৪ সন। জাগতিক সম্পর্কে বাবা ভোলানাথ শ্রীশ্রী মার পতি। ভোলানাথ ঢাকায় চাকুরীর সন্ধানে এসে শাহবাগে ঢাকা নবাব স্টেটের বিরাট বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কাজ পেলেন। প্রকাণ্ড বাগান, শ্রীশ্রী মায়ের থাকার উপযুক্ত স্থানই বটে! এখানে কীর্তনে শ্রীশ্রী মায়ের ভাবলীলার প্রকাশ হতে লাগল সর্বসমক্ষে। মাকে জানা-বোঝার আগ্রহে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। জ্ঞানী, গুণী ও শিক্ষিত সমাজের মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ হল শ্রীশ্রী মায়ের উপর।

এই সেই মিলন ক্ষেত্র ঢাকার শাহবাগ। এখানেই

বাংলা ১৩৩২ সনের পৌষ মাসে (ইংরাজী ১৯২৬, জানুয়ারী) পিতার সঙ্গে দিদির শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হল। মাতৃ চরণে আশ্রয় পেয়ে দিদির হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা দূর হল, অন্তর ভরে উঠল মাতৃ প্রেমরসে।

এবার মাতৃতীর্থে-স্নাত গুরুপ্রিয়াদিদির জীবন প্রবাহ বর্ণন করব। বর্ণন করব শ্রীশ্রী মায়ের জগৎকল্যাণ কার্য্যে অনন্তলীলার সহচরী কেমন করে নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন শ্রীশ্রী মায়ের চরণে।

দিদিকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার পৈতৃকবাড়ী সুলতানপুর গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশ)। শ্রীশ্রী মা এসেছেন মামার বাড়ী, মামাতো ভাইদের আহ্বানে। সঙ্গে অনেকেই এসেছেন —— যাঁদের মধ্যে দিদিও ছিলেন। আমি তখন খুবই ছোট। জানিনা কেন সেই প্রথম দর্শনেই দিদির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। দিদির কর্মব্যস্ততা ও তৎপরতা, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা, সিংহের মত চলার গতি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। পরণে সাধারণ একখানা পীতবর্ণের ধুতি, হাতে মোটা মোটা বালা, মাথায় এলোমোলো চুল, বৈরাগ্যের আভরণে দেহখানিতে দেবদুর্লভ রূপ ফেটে পড়ছে। দিদির সহজাত স্নেহ ভালবাসা, দিদির উৎসাহ ও উপদেশ, যার ফলস্বরূপ আমার জীবনও মাতৃচরণে নিবেদিত হয়েছে।

যাক্ মাতৃদর্শনের পর হতেই দিদি যতক্ষণ পারেন

মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। রাত্রে মাকে শুইয়ে মশারি ফেলে দিয়ে বাসায় ফিরতেন। আবার অতি প্রত্যুষে মায়ের ওঠার পূর্বে আসার ইচ্ছা রাখতেন। মায়ের লীলা দর্শনে যেন ছেদ না পড়ে। সে সময় মায়ের শরীর বোধ ছিল না; আগুন আর জলে ভেদ বোধ ছিল না। চলা ফেরার সময় স্থানের উচ্চ-নীচতায় খেয়াল থাকত না। অতএব দিদি মায়ের হাবভাব বুঝে শরীর সামলাতেন। কীর্তনে ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রী মা যাতে পড়ে গিয়ে ব্যথা না পান সেদিকে লক্ষ্য রেখে দিদি মার শরীর রক্ষা করতেন। দিদি উপস্থিত থাকলে ভক্তরা নিশ্চিন্ত হয়ে মায়ের ভাবলীলা দর্শন করতেন, আর বলতেন — "দিদি যেভাবে মায়ের প্রতি খেয়াল রাখেন, সামলান, আমরা দশজনে মিলে তা পারব না।" শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি দিদির এমনই একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা ছিল। আবার মায়েরও দিদিকে ছাড়া এক মুহূর্ত্ত চলত না। একদিন মা বলেছিলেন — "এখন এ শরীর দিয়ে সব কাজ ঠিকমত হয় না, তাই সাহায্য করার জন্য ভগবান তোমায় নিয়ে এসেছেন।" আমরাও অনেকেই দেখেছি, শ্রীশ্রী মা মুহুর্মুহু: দিদিকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। ছোটদের কাজ ছিল দিদিকে ডাকা। এমন কি মা হয়তো তিনতলায় বা অন্যত্র কোথাও পাহাড়ের উপর আছেন। দিদি মায়ের ডাক শোনামাত্রই মায়ের কাছে উপস্থিত হতেন, সিঁড়ি বা চরাইয়ের ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

একবার দিদি নিজ বাড়ীতে (তখন পিতার সঙ্গে তাঁর বাসা হতেই শ্রীশ্রী মায়ের কাছে যাতায়াত করেন) শ্রীশ্রী মা ও বাবা ভোলানাথকে ভোগ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। শ্রীশ্রী মা পরে ভোগে বসবেন বলে ভোলানাথকে খেতে বললেন। ভোলানাথের খাওয়া হলে মা দিদিকে নিয়ে ভোলানাথের পাতে খেতে বসলেন। শ্রীশ্রী মা অল্প খাবার মুখে দিয়েই দিদিকে খাইয়ে দিতে লাগলেন। দিদিও অবলীলায় মা যা-যা খাওয়াতে লাগলেন খেলেন। কিছুক্ষণ পর মায়ের ভাব বুঝে বললেন, "মা, তুমি খাবে না? শুধু আমাকেই খাওয়াচ্ছ?" শ্রীশ্রী মাও জবাব দিলেন, "আজ তোমায় খাইয়ে দিলাম, পরে তুমি আমায় খাওয়াবে।" শ্রীশ্রী মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। মায়ের নিজ হাতে খাওয়া বন্ধ হল। কারণ ভাত বা অন্য কিছু খাবার মুখে দিতে গেলেই তা ঝর ঝর করে পড়ে যেত, বা নীচের দিকে নেমে আসত। মায়ের তো সব আপনা হতেই হত। নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছুই সাধিত হয়নি। মার মনই ছিল না। তাই ইচ্ছার স্থান কোথায়?

মায়ের এই অবস্থা দেখে দিদিই মাকে খাইয়ে দিতেন। মায়ের ভাবের শরীরে কোনটা গ্রহণ কোনটা ত্যাগ খেয়ালই থাকত না। যাতে মায়ের সেবার কোনো ত্রুটি না হয় সেদিকে সর্বদাই সজাগ ও সচেতন থাকতেন দিদি। একনিষ্ঠ ভাবে শ্রীশ্রী মার ভাবশরীরের সেবাই ছিল দিদির পূজা, জপ-তপ,

ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা।

কেবল শ্রীশ্রী মার সেবা নয়, তাঁর আদেশে দিদি মাতৃসাধক ভাইজী ও অন্যান্যদের সেবাও অত্যন্ত একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। মায়ের নির্দেশে দিদি ভাইজীর সেবা অম্লান ভাবে করে গেছেন। কি করে ভাইজীর একটু আরাম হবে? রোগ যন্ত্রণার কষ্ট লাঘব হবে? এই ছিল তাঁর চিন্তা। বিরাম বিশ্রামহীন নিরন্তর সেবার ভাবটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। ভাইজীরই সেবা নয়, মায়ের নির্দেশে যখন যেভাবে যেখানে প্রয়োজন দিদির উপস্থিতি সর্বত্র। কত ভাবে কত লোকের সেবা দিদি করেছেন তার খোঁজ কে রাখে? এই সেবার কাজগুলোকেও তিনি মাতৃপূজারই অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন।

নিষ্কাম নি:স্বার্থ সেবাই পূজায় পরিণত হয়। সেবা শুধু কর্মে নয়, আত্মত্যাগে। তাই দিদির মাতৃমুখী সেবা বা কর্ম তপস্যায় পরিণত। একবার দিদিকে একজন প্রশ্ন করেন—"দিদি, আপনাকে যদি মায়ের সেবা ও মুক্তি এ দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, আপনি কোনটি নেবেন?" দিদির তৎক্ষণাৎ উত্তর ছিল, "মায়ের সেবা"। বীরাঙ্গনা তপস্বিনীর বীরোচিত উত্তর।

আর একবার দিদি শ্রীশ্রী মাকে উল্টো করে কাপড় পরিয়েছিলেন। তা দেখে তাঁর পিতা স্বামী অখণ্ডানন্দজী

মাকে বললেন, "মা, ও না জানে খাওয়াতে, না জানে কাপড় পরাতে, তুমি ওরই হাতে সব করাচ্ছ। শ্রীশ্রী মা বললেন, "যে নিজেরটা জানে না, আমি তার হাতেই সব গ্রহণ করি। আমি আজ উল্টা কাপড় পরেই থাকব।" সত্যিই তো নিজেকে ভুলে গিয়ে সেবাই প্রকৃত সেবা। যথার্থ সেবায় সেবকের একাগ্রতা ও আন্তরিকতাই বাঞ্ছনীয়। সেই সেবাই সাধনার, তপস্যার রূপ লাভ করে।

শত কাজ, শত ব্যস্ততার মধ্যেও দিদির প্রতিদিন নিজ হাতে একটি মালা গেঁথে শ্রীশ্রী মাকে পরানো ও চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া নিত্যকর্ম ছিল। একদিন তা করে শ্রীশ্রী মাকে অন্তরের প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—"আমি তো পূজা ইত্যাদি কিছুই জানি না।" মা উত্তর দিলেন, "তুমি যেভাবে দেবে তাতেই পূজা হবে।" তদ্‌গত প্রাণ ভক্ত যে ভাবে যা দেন তাই ভগবান গ্রহণ করেন। "ভাবগ্রাহী জনার্দন" —গীতায় তো শ্রী ভগবান সেকথাই বলেছেন। ভক্তের শুদ্ধভাবপূর্ণ, শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত পূজা মন্ত্রহীন হলেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ পূজা।

দিদির সাধনা ছিল ভিন্নতর। একান্তে বসতে দিদিকে কখনও দেখা যায়নি। তবে নির্বিচারে যেভাবে মাতৃ আদেশ পালন করতে দিদিকে দেখা গেছে তা অনেক ধ্যান ধারণার ফলেও লাভ হয় কি-না সন্দেহ। বস্তুত: সাধনার পথ বিভিন্ন হলেও সকল সাধকের একমাত্র সাধন লক্ষ্য হয় নিজ লক্ষ্য

প্রাপ্তি। শ্রীশ্রী মা বলেছেন, "স্বধন লাভের চেষ্টাই সাধনা।" তাই কোনো সাধকেরই নির্দিষ্ট সাধন জীবন পূর্ণতয়া জানা বা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় বিধিমত ব্রত-উপবাসের প্রয়োজন দিদির ছিল না। কারণ, দিদি শ্রীশ্রী মায়ের ভোগের আগে কখনও জলস্পর্শ করতেন না। রাত্রেও ভক্তদের আসা-যাওয়া শেষ হলে শ্রীশ্রী মাকে শয়ন করিয়ে মশারি ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে সন্ধ্যা করতেন। তারপর কিছু খেতেন, তা যত রাত্রিই হোক। এই ছিল দিদির প্রাত্যহিক নিয়ম। অসময়ে কখনও কোন পূজার কাজ করতে হলে শ্রীশ্রী মা দিদিরই সন্ধান করতেন। কারণ সে সময় একমাত্র দিদিরই না খেয়ে থাকার সম্ভাবনা।

অবিরাম পরিশ্রমের মধ্যেও দিদির আরামের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। শ্রীশ্রী মায়ের নিত্য সেবিকা হিসাবে ভক্ত হৃদয়ে দিদিরও সম্মান, শ্রদ্ধা অব্যাহত ছিল। শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে যেখানেই গেছেন কোনও স্থানে ভক্তদের দ্বারা কৃত আরামের ব্যবস্থাকে তিনি গ্রহণ করেন নি। শ্রীশ্রী মা যেখানে বিশ্রাম করছেন, তারই কাছে বারান্দায় হয়তো মায়েরই দেওয়া খেসটি বিছিয়ে বসে যেতেন এবং ঐ বিশ্রামের ফাঁকে চিঠিপত্র পড়া, লেখা, ভক্তদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলা ইত্যাদি কাজ সেরে নিতেন। রাত্রেও শ্রীশ্রী মায়ের শোওয়ার পর ঐ খেসটি বিছিয়ে নিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়তেন। কিন্তু মায়ের প্রতি স্থির

লক্ষ্যটি সর্বদাই থাকত। এমনও দেখা গেছে, মায়ের প্রয়োজনে ডাকার আগেই দিদি উপস্থিত। দিদির এই উন্মুখ ভাবটি দেখে কোনো ভক্ত মহিলা দিদিকে নন্দীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিবানুচর নন্দী যেমন শিবের দ্বারে প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় সদা বিরাজমান। দিদির এই অতন্দ্র প্রহরীর ভাব সদা উন্মুখ ও উৎকণ্ঠিত ভাব দেখে আমারও অনেক সময় কৃষ্ণদর্শনমানসে উৎকণ্ঠিতা সদাতন্মনস্কা গোপীদের কথা মনে হয়েছে।

ধনী পিতামাতার গৃহে আদরে আরামে লালিতা পালিতা দিদি কি ভাবে এত কষ্ট সহ্য করে আরাম ত্যাগ করে নিজেকে নি:শেষে বিলিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রী মা ও মাতৃভক্তদের সেবা করেছেন তা দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। মাতৃ সান্নিধ্য ও মাতৃসেবার সুযোগ যে জীবনে কত মূল্যবান দিদি তা আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। আবার আশ্রমের কোনো কাজে শ্রীশ্রী মাকে ছেড়ে অন্যত্র আছেন, সেখানেও সর্বদাই ভক্তসনে মায়ের কথাই বলছেন। মাতৃনাম ছাড়া দিদি কখনও থাকেন নি।

মায়ের সেবা তো দিদির ধ্যান-জ্ঞান ছিলই, আবার শ্রীশ্রী মাও বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ছলে দিদিকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন। একবার শ্রীশ্রী মা ঢাকা ছেড়ে অন্যত্র চলেছেন, কিন্তু দিদিকে সঙ্গে নেবেন না। মায়ের এই সিদ্ধান্তে ভক্তরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত। কারণ

দিদিবিহীন মাকে ভাবাই যায় না। আবার দিদির পক্ষেও মাতৃবিরহ যে কত বেদনাদায়ক ও অসহ্য! তবুও যত বেদনা দায়কই হোক মায়ের আদেশ নির্বিচারে পালন করা দিদির স্বভাব ছিল। তাই অন্তরে ব্যথা নিয়েও মাকে বিদায় জানাচ্ছেন। যিনি ব্যথার কারণ হন, তিনিই ব্যথার প্রলেপ দেন! রওনা হওয়ার পূর্বে শ্রীশ্রী মা দিদির মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন — "ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্যই সাধনার অঙ্গ।" আর নিজের গলার সোনার হারটি দিদির গলায় পরিয়ে দিয়ে হারটি গলায় রাখতে বললেন। এভাবে দিদিকে প্রেমপূর্বক ধৈর্য্যের শিক্ষা দিলেন।

দিদি আগে কখনও একাকী থাকেন নি, চলাফেরাও করেন নি। আশ্রমের কাজে যখনই কোথাও গেছেন সঙ্গে পিতা স্বামী অখণ্ডানন্দজী থেকেছেন।

এবার শ্রীশ্রী মা চাইলেন দিদিকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে। শ্রীশ্রী মা দিদিকে একাকী রেখে স্বামীজীকে নিজের সঙ্গে নিলেন। একে তো মাতৃবিরহ, তায় পিতাও সঙ্গে থাকছেন না। ব্যথাতুরা দিদিকে শ্রীশ্রী মা বললেন — "সারাজীবন তো এভাবেই রয়েছ। এখন বন্ধন না রেখে পুরুষের ভাবধারায় ক্রিয়ার গতিতে চলা। তোমাকে পৈতা দেওয়া হয়েছে; ব্রহ্মচারীদের মত ভস্ম লাগাবে, শিখা রাখবে" ইত্যাদি। মা বলেন "সবের মধ্যেই সব।" এর মধ্যে যা কিছু আছে তা মাই জানেন। তবে দিদিকে যে

আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা দিলেন এবং ব্রহ্মচারীর সকল অনুশাসন মেনে চলতে বলছেন — এটাতো স্পষ্টই পরিজ্ঞাত হল।

দিদির পৈতাও হয় শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে এক বিচিত্র উপায়ে। একবার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয় সস্ত্রীক মায়ের কাছে ঢাকায় এসেছেন। ভোলানাথের বোন হিসাবে তাঁর স্ত্রী আমাদের পিসিমা। পিসিমা ও শ্রীশ্রী মা দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। হঠাৎ পিসিমা রসিকতা করেই তাঁর হাতের বাঁশের লাঠিটি শ্রীশ্রী মার হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও তোমার দণ্ড।" শ্রীশ্রী মায়ের তো সবের মধ্যেই সেই আধ্যাত্মিক সুরের রেশটি গ্রহণের দিক ছিল। সুতরাং শ্রীশ্রী মা উক্ত বংশদণ্ডটি আশ্রমে সুরক্ষিত নিত্য যজ্ঞাগ্নিতে স্পর্শ করিয়ে নিজের পরিহিত রেশমী বস্ত্রের সূতো দিয়ে জড়ালেন এবং দিদির হাতে তা দিয়ে বললেন — "আজ এই দণ্ডটি ছেড়ে কথা বোলো না।" পিসিমা এসব ব্যাপার দেখে কৌতুক করে বললেন — 'এখন ব্রহ্মচারীর গেরুয়া বস্ত্র কই ?' শ্রীশ্রী মাও হারবার পাত্রী নন। তিনি তৎক্ষণাৎ সামনে উপস্থিত বেবীদির দিকে চেয়ে বললেন, "ব্রহ্মচারীর গেরুয়া বস্ত্র বেবী নিয়ে আসবে।" বেবীদি পরে তা আনলে শ্রীশ্রী মা সেই বস্ত্র নিজে পরে কিছুক্ষণ পর দিদিকে সেটি দিয়ে বললেন, "এই বস্ত্রটি পরে কিছুক্ষণ বসে জপ কর।" দিদি তাই করলেন। মায়ের সোনার হার দিদির গলায় পূর্ব হতেই পৈতার

মত ছিল। শ্রীশ্রী মায়ের তো পূর্ব হতে কোনো সংকল্প থাকে না। তৎক্ষণাৎ যা হয়ে যায়। কাজেই এভাবে লীলাচ্ছলে পৈতা ও গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করে দিদিকে দিয়ে শ্রীশ্রী মা কৃপা করে ব্রহ্মচারীর কৃত্য করিয়ে নিলেন; তা আমরা পরে অনুধাবন করতে পেরেছিলাম।

তথাপি আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্ত্রে নারীদের উপনয়নের বিধান আছে কিনা তা জানার জন্য শ্রীশ্রী মা কাশীর পণ্ডিতদের নিকট জিজ্ঞাসা করালেন। এ ব্যাপারে বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজজীর মতও জানতে চাওয়া হল। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে হারীত সংহিতায় 'পুরা নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনংস্যাৎ" ইত্যাদি বচনের দ্বারা নারীদের উপনয়ন সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া গেল। মহাপুরুষগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণকে অতিক্রম করেন না। এভাবে শাস্ত্রের মর্য্যাদা দান করে শাস্ত্রীয় প্রমাণকে দৃঢ়তা প্রদান করাই তাঁদের বিধান। কবিরাজ মহাশয় বললেন, "যেখানে শ্রীশ্রী মা বলেছেন, সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নাই।" সিদ্ধপীঠ তারাপীঠে আনুষ্ঠানিকভাবে দিদির যজ্ঞোপবীত ধারণ হল। আচার্য্য গুরু ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বান শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য্য)। পৈতা ধারণের পর হতে দিদির চলা বলায় পুরুষোচিত ঢং দেখে অনেকে তাঁকে 'ব্রহ্মচারী দাদা' নামে ডাকতে লাগলেন।

এই পুরুষোচিত ঢং দিদির মধ্যে এতই স্বাভাবিক

ছিল যে তাঁকে পুরুষ বলে ভ্রম হওয়া অযৌক্তিক ছিল না। কেবল পুরুষোচিত ঢং নয়, দিদির মধ্যে পুরুষোচিত ব্যক্তিত্বও লক্ষণীয় ছিল। এই ব্যক্তিত্বের জন্য বাইরের যে কোনো কাজে দিদি সফল হতেন। একবার কোনো কাজে কাশী হতে কলকাতা যাওয়ার পথে গাড়ীর মধ্যে উঠে দিদি ক্লান্ত থাকায় শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর কামরাটি যাত্রীপূর্ণ হলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংশয়াচ্ছন্ন গুঞ্জন শোনা গেল। ধীরে ধীরে তাদের ভয় উপস্থিত হল। তখন এক বর্ষীয়সী মহিলা সাহসের সঙ্গে ভয়ের কারণে দিদিকে ডেকে বললেন — "ওদাদা, এটা মেয়েদের কামরা। আপনি অন্য কামরায় যান।" দিদি উঠে বসে স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিলেন, "মেয়েদের কামরা জেনে বুঝেই তো উঠেছি।" দিদি সকলের সঙ্গে এমন গল্প জুড়ে দিলেন যে তাঁরা আশ্চর্য্য তো হলেনই পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে অনুতপ্ত হলেন ভেবে যে একজন সাধিকার সঙ্গে এরূপ আচরণ করেছেন; বরং তাঁর সহযাত্রায় তাদের জীবন ধন্যই হয়েছে। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না কি ভাবে তাঁকে তারা হৃদয়ের অনুরাগ জানাবে। কিছুক্ষণ আগে যিনি ভীতিপ্রদ ছিলেন এখন তিনিই কত আপন জন। এইরূপ ছিল দিদির ব্যক্তিত্ব।

শ্রীশ্রী মাও দিদিকে পুরুষ ভক্তদের মধ্যে কখনও কখনও ছেড়ে দিতেন। একবার নবদ্বীপে শ্রীশ্রী মা মেয়েদের নিয়ে কীর্তনে ব্যস্ত। বাইরে পুরুষ ভক্তেরা মায়ের দর্শনে

অপেক্ষমান। মা তখন দিদিকে ভক্ত ভাইদের নিয়ে কীর্তন করতে বললেন। দিদি তাই করলেন। এই পুরুষোচিত ভাবের প্রাধান্যে দিদির নারীভাব কত সময় চাপা পড়ে যেত, তার প্রকাশ অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে। এই ভাবটি লক্ষ্য করে আমাদের মৌনীমা দিদিকে 'দাদাভাই' নাম দিয়েছিলেন। কন্যাপীঠে আজও দিদি 'দাদভাই' নামেই পরিচিতা।

কেবল শ্রীশ্রী মার প্রধানা সেবিকা ও লীলাসঙ্গিনী বলেই নয়, দিদির এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যার ফলে সকলেরই তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব ছিল। অনেকে শ্রীশ্রী মার সঙ্গে তাঁকে দেখতে না পেলে আনন্দ পেতেন না।

একবার এলাহাবাদে পূর্ণকুম্ভ চলছে। শ্রীশ্রী মায়েরও ক্যাম্প লেগেছে। জমজমাট প্রোগ্রাম। প্যাণ্ডেলে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' চলছে। শ্রীহরিবাবা আছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চামর-ব্যজন করছেন। শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে দিদিও আছেন। এমন সময় খবর এল এক মহাত্মা শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে একান্তে দেখা করতে চান। মা সকলকে বসতে বলে আপন কুটিয়ায় গেলেন। দিদি মায়ের নির্দেশে প্যাণ্ডেলেই বসে রইলেন। কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে কথাবার্তার পর ঐ মহাত্মাজী দিদির খোঁজ করলেন। তাঁর আগ্রহে দিদি এসে মহাত্মাজীকে প্রণাম করে উঠতেই তিনি জানালেন— "শ্রীশ্রী মায়ের কাছে আপনি সব সময় থাকেন, এবার আপনাকে না দেখতে

পেয়ে কেমন বিসদৃশ লাগায় আপনার খোঁজ করলাম।" দিদিও সুযোগ পেয়ে মহাত্মাজীকে হাত জোড় অবস্থায় অভিযোগ করলেন — "হ্যাঁ, মহারাজজী, আজ মা আমাকে না নিয়েই চলে এসেছেন।" মহারাজজীও হেসে রসিকতা করে বললেন — "মা, দিদি কো তো কেবল মা হী চাহিয়ে। আপ দিদিকো ছোড়না নহী।" দিদিও খুশী হয়ে প্রার্থনা জানালেন, "মহারাজজী কৃপা করুন যেন শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গ ও সেবা নিয়েই থাকতে পারি।" তখন সকলেরই খুব হাসি। শ্রীশ্রীমার নিকট ব্যক্তিত্বময়ী দিদির সদা উপস্থিতি এমনই স্বাভাবিক ছিল।

একবার কন্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপিকা শ্রী ১০০৮ সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজীর শিষ্যা গঙ্গাদেবী পঞ্চতীর্থ দিদিকে পরীক্ষার ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — "দিদি, তুমি সর্বকার্য্যে মায়ের কথায় এক পায়ে খাড়া। বলতো, মা যদি তোমায় কন্যাপীঠের কোন মেয়ের গলা কাটতে বলেন, তুমি তাই করবে ?" নি:সঙ্কোচে বিনা দ্বিধায় দিদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন — "মায়ের আদেশ হলে অবশ্যই পারব।" দিদির এইরূপ সহজ উত্তরে গঙ্গাদি স্তম্ভিত, হতবাক্। দিদিকে প্রণাম করে বললেন, "দিদি, তোমার জীবন ধন্য! মায়ের প্রতি এরূপ দৃঢ় একনিষ্ঠ ভাবটি সত্যই বিরল! এই বিশ্বাসের ফলেই তোমার জীবন এত সুন্দর।"

এরূপ ভাবের অধিকারিণী দিদির সম্বন্ধে আর একটি

ঘটনা এখানে উল্লেখনীয় মনে করি। মনমোহনদা মায়ের ঢাকার পুরাতন ভক্ত, কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। একবার কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে আলোচনার জন্য দিদি তাঁর কাছে গেছেন। মনমোহনদাকে নিজ কার্য্যের কথা জানালে, তিনিও নিজের অভিমত জানিয়ে দিদির উত্তরের অপেক্ষায় আছেন। দিদি চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে ওঠার অনুমতি চেয়ে বললেন, "দাদা, মাকে আপনার কথা বলব। তার উত্তরে মা যা বলেন তাও আপনাকে জানাব।" মনাদা তখন রেগে গিয়ে বললেন — "দিদি, তোমার কি কোন নিজস্ব বুদ্ধি নাই? সবই মা যা বলবেন? মা যদি বলেন, "আজ পশ্চিমে সূর্য্য উঠেছে তুমি কি উপরে চাইবে না? বিশ্বাস করে নেবে?" দিদির বিনীত উত্তর — "তাই যেন পারি, দাদা।" পরে মনাদা মায়ের কাছে জানালেন, "মা, আজ দিদির উপর যেমন রাগ হয়েছে, তেমনিই আশ্চর্য্য হয়েছি।" শ্রীশ্রী মা অমনি ছোট্ট মেয়ের মত হেসে বললেন — "বাবা, দিদি বুঝি তোমার কথার কোন জবাব দেয় নাই?" তখন সকলেই খুব হাসতে লাগলেন।

অনেক দিন আগের কথা। তখন কন্যাপীঠে পড়ি। একদিন স্কুল ছুটির পর জল খাবারের ঘন্টা বেজেছে। আমরা সকলেই উপস্থিত। শ্রীশ্রী মা হঠাৎ উপরের ঘর থেকে নীচে এসে আমাদের মধ্যে বসে পড়েছেন। সেদিন কাঁচা পাকা মিলিয়ে পেয়ারা ছিল জলখাবার। শ্রীশ্রী মা বলছেন,

"আমায় দাও, আমিও খাব।" মাকে দেওয়ার কোনো পাত্রও নেই, পেয়ারা কাটারও কোনো ব্যবস্থা নেই। অবশেষে থালার কিনারা দিয়ে কেটে এক টুকরো পেয়ারা মাকে দেওয়া হল। মা খুব মজা করে পেয়ারা খাচ্ছেন আর বলছেন, "খুব ভাল পেয়ারা। মিষ্টি আছে।" মায়ের খাওয়া ও বলার ঢংটি এত সুন্দর যে সকলেরই খুব আনন্দ হচ্ছে, বিশেষত: স্বয়ং মা তাদের সঙ্গে বসে তাদেরই খাবার খাচ্ছেন। একটু পরে মা দিদিকে ডাকলেন। দিদি সবে মাত্র দুপুরের খাবার খেতে বসেছেন। মায়ের ডাকে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে এসে দেখেন তাঁর মেয়েরা মাকে কাঁচা পেয়ারা খাওয়াচ্ছে। দিদিতো এসব দেখে অবাক! মায়ের শরীর ভাল না থাকায় মাকে কত বুঝে বুঝে খাওয়ানো হয় আর মাকে মেয়েরা এই পেয়ারা খাওয়াচ্ছে। মেয়েদের কিছু বলতে যাবেন এমন সময় শ্রীশ্রী মা দিদিকে বললেন — "দিদি, এই পেয়ারা তুমি তো তোমার মেয়েদেরই সব দিয়ে দিলে, এই শরীরকে তো একটু দিতে পারতে, এই শরীরকেই তো দিয়েছিল।" শ্রীশ্রী মায়ের এই কথায় দিদি লজ্জায় অবনত। মায়ের তো খাওয়ার দিকে খেয়াল নেই বললেই হয়। কিন্তু এ লীলা কেন? ভগবান ভক্তের ভাব দেখেন, বস্তু দেখেন না। আর দিদির তো মায়ের লীলার মায়ের কথার অর্থ বোঝার অদ্ভুত শক্তি। তিনি বুঝে নিলেন, ভগবানের জন্য আনা বা নামে দেওয়া যে কোনো বস্তু তাঁকে অর্পণ না করে গ্রহণ করা উচিত নয়। মায়ের এই লীলার মধ্যে এই বিষয়টিই শিক্ষণীয় ছিল। এর পর

দিদি কন্যাপীঠে নিয়ম করে দিলেন যে, এখন থেকে যা আসবে প্রথমে মায়ের ভোগ দেওয়া হবে, তারপর সকলে গ্রহণ করবে। তারপর থেকে সমস্ত জিনিষ, এমনকি নুন পর্য্যন্ত বেশী করে ভোগ দিয়ে রেখে দেওয়া হত। দিদির বুদ্ধি এতই প্রখর ও স্বচ্ছ ছিল যে শ্রীশ্রী মায়ের মৌন অবস্থায়ও দৃষ্টিমাত্র দিদি বুঝতে পারতেন যে মা কি বলতে চান বা মায়ের কি প্রয়োজন? অবশ্যই দিদির মত উপযুক্ত আধারে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাতেই এসব সম্ভব হত।

অসুস্থ অবস্থাতেও দিদির মাতৃ নিষ্ঠায় বা মাতৃ আজ্ঞা পালনে কোনো শৈথিল্য ছিল না। একবার শ্রীশ্রী মা আছেন বিন্ধ্যাচলে। দিদি কাশী আশ্রমে অসুস্থ অবস্থায়। বিছানা ছেড়ে ওঠা পর্য্যন্ত ডাক্তারের নিষেধ। ট্রাংকল এলো, মা দিদিকে বিন্ধ্যাচলে ডেকেছেন। মায়ের ডাক উপেক্ষা করা চলে না, দিদি যাবেনই। দিদির দৃঢ়তা দেখে ডাক্তার পর্য্যন্ত অবাক! দিদি যাওয়ার জন্য একেবারে প্রস্তুত। ডাক্তার উপায়ান্তর না দেখে নিজে সঙ্গে করে দিদিকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিলেন। শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে দিদি সুস্থই রইলেন। তিনদিন সানন্দে কাটিয়ে আবার কাশী ফিরে এলেন। সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় দিদির এই নিষ্ঠার সঙ্গে মাতৃ আজ্ঞা পালনের দৃঢ়তা আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, কিন্তু দিদির নিকট এই স্থিতিটি ছিল সহজাত ও স্বাভাবিক।

অমিত শুদ্ধ সংস্কারের অধিকারিণী দিদির সহজাত

ও স্বাভাবিক বৈরাগ্য এবং অনাসক্তের ভাবটি আশৈশব পরিস্ফুরিত ছিল। সুতরাং এ বিষয়ে দিদি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। কর্মকুশলতা, চরিত্রের দৃঢ়তা, সেবাভাব ইত্যাদি সাধারণ গুণে দিদি যেমন বিভূষিতা ছিলেন, তেমনি তাঁর মধ্যে অসাধারণ গুণটি ছিল এই নিস্পৃহতা। সকল কার্য্যে পরিপাটির নিদর্শন, সর্বত্র নিখুঁত সৌন্দর্য্যবোধ, কিন্তু নিজের প্রতি একেবারেই উদাসীন। দিদির এই স্বভাবটি মা হরকামিনী দেবীও লক্ষ্য করেছিলেন এবং মেয়ের এরূপ ভাব ত্যাঁকে ভাবিত করে তুলে ছিল। তাই আদরিণীকে তিনি নিজের কাছে কাছে রাখতেন। শ্রীশ্রী মায়ের কাছে এসে এক বৃহৎ জগতে প্রবেশ করে এই অসাধারণ দিকটি আরও বিকশিত হয়েছিল ও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কাজের সুবিধার জন্য দিদি গায়ে একটি সাধারণ কোট পরতেন আর তার উপর একটি চাদর নিয়ে দোকান-বাজার, কোর্ট-কাছারী, অফিস সর্বত্র যাতায়াত করতেন। এই সাধারণ বেশেই দিদির মধ্যে এমন এক স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হত যে ঐ বেশে যেখানেই গেছেন সেখানেই সসম্মানে কর্মে সফল হয়ে ফিরে এসেছেন। পিতৃগৃহেও যেমন ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য্য ছিল, শ্রীশ্রী মায়ের কাছে এসেও তেমনি ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি দেখেছেন। এর মধ্যে থেকেও দিদি নিজের সুখ-সুবিধা গ্রহণ করেন নি। নিজের সুখ সুবিধার জন্য মায়ের সেবায়, ভক্তদের সেবায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দিদি কখনও ভাবতেই পারেন নি। জলের মধ্যে বাস অথচ গায় জল লাগে না এমনই পদ্ম পত্রের মত নিরাসক্ত

ভাবটি সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

একবার মায়ের সঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করতে যাওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন সত্যদেব ঠাকুরের শিষ্য শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে কিছুটা পায়ে হাঁটতে হয়েছিল। ঐ রাস্তা অত্যন্ত খারাপ, কন্টকময় ছিল। সকলেই জুতা পরে ছিল। কিন্তু দিদি খালিপায়েই শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে নিশ্চিন্তভাবে হাঁটছিলেন। মায়ের সঙ্গে এরূপ রাস্তায় খড়ম পায়ে চলা অসুবিধা, তাই খড়ম ছেড়ে এসেছেন; আর জুতা পরা তো দিদি মায়ের কাছে আসার পরই ত্যাগ করেছেন। দিদিকে এভাবে হাঁটতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গোপাল ঠাকুর বললেন — "দিদি, এই জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটতে আমার কষ্ট হচ্ছে, আর তুমি কি করে খালি পায়ে হাঁটছ বুঝতে পারছি না, তোমার সাধন বল আছে বলতেই হবে।" দিদি এই রূপই ধৈর্য্য সহ্যশীলা ছিলেন।

অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও দিদি মাতৃ প্রসঙ্গ ছাড়া থাকতেন না। অনেক সময় রাত্রে দিদিকে শ্রীশ্রী মায়ের বই পড়ে শোনাতাম। এই সময়টার জন্য দিদি উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। দিদির এই মননের দিকটি লক্ষ্য করে একদিন বই পড়তে পড়তেই বলেছিলাম — "দাদা ভাই, আপনার এই মননের জন্যই আমাদের কাছে চিরদিন বেঁচে থাকবেন, কেননা "মননেন হি জীবতি।" দিদি সেদিন একথা এড়িয়ে

গিয়ে বলেছিলেন — "পড়্, মায়ের কথা শোনা।" দিদির মধ্যে আত্মগোপন ভাবটিও লক্ষণীয় ছিল।

আর একদিন দিদির কাছে বসে বই পড়ছি। দিদিকে বললাম — "দাদাভাই, বাল্মীকি লিখেছেন রামায়ণ, বেদব্যাস লিখেছেন মহাভারত, আর আপনি লিখেছেন আমাদের মায়ের অমরকাহিনী। রামায়ণে রামলীলা, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণলীলা, আপনার বইয়ে মাতৃলীলা। তাই আপনি আমাদের বাল্মীকি, রাজী তো?" দিদি সেদিন অসুস্থতার মধ্যেও খুব হেসে বলেছিলেন, "কি যে কস্, বাল্মীকি ছিলেন সে যুগের কত বড় ঋষি, কার সঙ্গে কার তুলনা।" কত সুন্দর, সহজ আত্মগোপন ভাবটির প্রকাশ ভঙ্গী যা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।

গুরু বা ইষ্টের প্রতি দিদির শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও নিষ্ঠার ধারাটিও ছিল অনন্য ও বিচিত্র। শ্রীশ্রী মাকে শুধু সেবা করে ও মার আদেশ পালন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না শ্রীশ্রী মা সম্বন্ধে তাঁর যে অনুভূতি হয়েছিল তাকে ধরে রাখার কি আপ্রাণ চেষ্টা। শ্রীশ্রী মায়ের ব্যবহৃত জিনিষ, মায়ের হাতের সেলাই, বেতের কাজ, যে কলম দিয়ে লিখেছেন সেটি, হোলি খেলেছেন সেই কাপড়টি, মায়ের সম্বন্ধে যখন যে বই বা ছবি প্রকাশিত হয়েছে তা মাকে দেখিয়ে, স্পর্শ করিয়ে, একটু পড়ে শুনিয়ে কত যত্ন করে আলমারিতে সাজিয়ে রাখতেন দিদি। এমন কি শ্রীশ্রী মায়ের

নখ, চুল পর্য্যন্ত সযত্নে শিশিতে ভরে রাখতেন, মায়ের হাতের ও পায়ের ছাপ উঠিয়ে তা বাঁধিয়ে রাখতেন। পুরীধামে বা বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী মা হাঁটছেন, দিদি ঝট্‌ করে মায়ের চরণ স্পৃষ্ট রজ খানিকটা উঠিয়ে নিজের কপালে লাগিয়ে, সামনে যাঁরা থাকতেন তাঁদের দিয়ে আবার কিছুটা আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসতেন। মা কোথায় স্নান করেছেন সেই স্নান জল নিজে মাথায় নিতেন আবার বোতলে ভরে রেখে দিতেন, পরে কাজে লাগবে। শ্রীশ্রী মায়ের যেখানে যেখানে ভাব সমাধি হয়েছে সে স্থানের, মার জন্মস্থানের মাটি নিয়ে এসে হাঁড়িতে ভরে উপরে নাম পর্য্যন্ত লিখে অতি সযত্নে রাখতেন। নিজে দিদি প্রতিদিন মায়ের চরণামৃত, চরণধূলি গ্রহণ করতেন। অসুস্থ অবস্থায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হত না। এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এক অকল্পনীয় গভীর হৃদয়ের পরিচয়।

দিদির জীবন সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিরন্তর মাতৃসেবা, মাতৃ সঙ্গ, মাতৃ আদেশ পালন। এত সব করেও কখনও পরিশ্রান্তি বোধ করেন নি বা এক-ঘেয়েমি বোধ করেন নি। মাতৃ দর্শনে তৃপ্ত হয়ে দূরে সরে থাকেন নি কখনও। মায়ের কোনো লীলারসে বঞ্চিত হওয়া একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। যেন ভগবৎ প্রেমরস পিপাসা কখনও মেটেনা-এর জ্বলন্ত উদাহরণ দিদির জীবন। সর্বক্ষণ মাতৃময়ী হয়ে থাকাই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল। এমন কি অসুস্থ অবস্থাতেও নিজে হেঁটে মায়ের কাছে যেতে পারছেন

না, অপরের উপর নির্ভর করে যেতে হবে তখনও সেই সময়টির জন্য চাতকের মত উন্মুখ হয়ে থাকতেন। দিদির এই একমুখী উন্মুখ ভাবটিই সাধনাস্বরূপ ছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি নির্বিচার প্রেম ও বিশ্বাস অটুট ছিল।

শ্রীশ্রী মাকে দর্শন করেই দিদি বুঝেছিলেন শ্রীশ্রী মায়ের সহজাত মাতৃত্ব। অসীম হয়েও যিনি নিজেকে সীমায় বেঁধে সন্তানের হাত ধরেছেন, তাদের মত করে কথা বলেছেন, চলেছেন, ফিরেছেন, তাঁর পূর্ণতারই পরিচায়ক। তাই দিদি মায়ের স্বাভাবিক গতিবিধির মধ্যেও এমন এক মাধুর্য্যের এমন এক সত্যের অনুভব করেছিলেন, যা ধরে রাখার জন্য নিত্য ডায়েরী লেখা তাঁর আরাধনারই অঙ্গস্বরূপ ছিল। যত রাতই হোক সকল কাজ সমাপ্ত করে লিখতে বসতেন। অনেক সময় ঝিমিয়ে পড়তেন, তবুও নিজের ডায়েরী, মায়ের সমস্তদিনের কার্য্যসূচী ইত্যাদি লিখে তবে শুতে যেতেন। আমরা অনেক সময় দিদিকে এ থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছি, কিন্তু দিদি তাঁর নিত্য লেখার কাজটি সমাপ্ত করেই শুতে যেতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীশ্রী মায়ের এই সব স্বাভাবিক লীলা সৌন্দর্য্য একদিন সকল মানুষের কাছে মাধুর্য্যময় হয়ে উঠবে, জীবনের পাথেয় স্বরূপ হবে। পরবর্তীকালে এই ডায়েরীই "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী" নামে পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করে গেছেন। দিদির

মাতৃ আরাধনার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রী মায়ের লীলা বিলাস সংগ্রহ এক অমর কীর্তি। অসুস্থতার মধ্যেও এই কাজে ভাটা পড়েনি।

শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে মেয়েদের সুশিক্ষা ও সদ্ভাবনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রাচীন গুরুকুল শিক্ষার আদর্শে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ ও শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ, এই দুই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা দিদির কর্মময় জীবনের আর এক মহান কীর্তি। এই কন্যাপীঠ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে সকলের সুপরিচিত ও আজও সমাদৃত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তিতে ছিল দিদির অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা। মেয়েদের সুপোষণের সুব্যবস্থা করার জন্য দিদিকে একদিন ভক্তদের গৃহে গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে হয়েছে। কাজেই শ্রীশ্রী মা যেমন কন্যাপীঠের স্নেহ শীলা জননী, গুরু, ইষ্ট, পরম বন্ধু এবং মায়ের মধুর হতে মধুরতর লীলাস্মৃতি যেমন কন্যাপীঠের সঙ্গে জড়িত, তেমনি দিদির স্নেহ এবং প্রেম বর্ণনাতীত। দিদির আন্তর স্নেহ সম্পদে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাপীঠের এক অধ্যাপক দিদিকে 'কল্পতরু' আখ্যা দিয়েছিলেন। কন্যাপীঠের মূল সঞ্চালিকা তিনিই। মেয়েদের প্রয়োজন, তাদের আব্দার দিদিই পূরণ করতেন। বাইরে দিদি কঠিন, কিন্তু অন্তরে অন্ত:সলিলা ফল্গুধারার ন্যায় গুপ্ত স্নেহ রসধারায় পূর্ণ।

শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে কাশীধামে মায়ের আশ্রমে

১৯৪৭ সন হতে ১৯৫০ সন অবধি অনুষ্ঠিত হয় এক কোটি গায়ত্রী মন্ত্রে 'অখণ্ড সাবিত্রী মহাযজ্ঞ'। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এক মহান কর্ম, জাগতিক দৃষ্টিতেও এক বিশালতম কঠিনতম কর্ম। এই সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পরোক্ষভাবে প্রধান হোতা ছিলেন দিদি গুরুপ্রিয়া। এই মহৎ কর্ম সম্পাদন করতেও শ্রীশ্রী মায়ের দ্বারা নির্দেশ লাভ করেছেন তিনি। তাঁর একমাত্র সম্বল শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি অটুট বিশ্বাস। মাতৃকৃপা রূপ মূল মন্ত্রই দিদির শক্তি ও উৎসাহের মূল উৎস। দিদির না আছে অর্থবল, না আছে লোকবল। এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটতে চলেছে। সহায় সম্বলহীনা দিদির অবস্থা দেখে মা একদিন বলেছিলেন, "দিদি, তুই যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলি।" "তোমার চরণই আমার একমাত্র ভরসা—" দিদির এই নির্ভীক উত্তরে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হলেন।

এই মহাযজ্ঞের মূল ইতিহাসের সূচনা হয় ১৩৩৩ সনে (ইংরাজী ১৯২৬ সন)। বাবা ভোলানাথ কর্তৃক সম্পাদিত কালী পূজায়। চিন্ময়ী ও মৃন্ময়ী মায়ের অভিন্নরূপে এক অভিনব পূজার যজ্ঞাগ্নি শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে বিসর্জিত হল না। উক্ত কালী পূজার যজ্ঞাগ্নি পাত্র শ্রীশ্রী মা হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে আপন খেয়ালে বলে উঠেছিলেন, "দেখ কি ? এই যজ্ঞের আগুন মহাযজ্ঞে লাগিয়ে দেব।" সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে সেই যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করে রাখা হয়েছিল। শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে যে মহাযজ্ঞের সূত্রপাত, তারই

মহানুষ্ঠান দিদির অক্লান্ত ও নিষ্ঠাযুক্ত কর্মক্ষমতায় সুসম্পন্ন হয়েছিল। পণ্ডিতগণ ও কাশীর বিখ্যাত আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন — এই বিশাল কার্য্য যেরূপ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন হল তা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।' এই নিষ্ঠা, শ্রদ্ধার মূলে দিদিই। তাঁরই সুপরিচালনায়, সুতত্ত্বাবধানে ও কর্মকুশলতায় অভাবনীয়ভাবে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল এবং মহা-সমারোহে বিশাল কর্মযজ্ঞ সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল।

লীলাময়ী শ্রীশ্রী মা। এক সময় গৃহস্থ বাড়ীতে প্রবেশ করবেন না এরূপ মায়ের খেয়াল হল। ফলে ভক্তগণের আগ্রহে স্থানে স্থানে শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গলাভের আশায় ও মায়ের অবস্থানের সুবিধার্থে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হতে লাগল। সেখানেও সুপরিকল্পনা ও সুব্যবস্থাযুক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে কর্মযোগযুক্তা দিদি। কাশী আশ্রম, হাসপাতাল, কন্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠ সমস্তই দিদির সুপরিকল্পনায় ও সুব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে। আশ্রমের যে কোন প্রয়োজনে দিদি নিজের অসুস্থতা, জল-ঝড়, রৌদ্র সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, হাসিমুখে কাজ করে গেছেন, কখনও বিমুখ হননি। দিদির কর্মনিষ্ঠতা, বুদ্ধির প্রখরতা, কর্মকুশলতা, সর্বোপরি হৃদয়বত্তা নজির বিহীন । তাই শ্রীশ্রীমার একজন আশ্রিতা সাধিকা মৌনীমা মাকে বলেছিলেন — "মা, এই আশ্রমের যা কিছু দিদির শরীরের

রক্ত দিয়ে গড়া। দিদি যা করল একলা, ৮ জন পুরুষ ও তা করতে পারবে না।" এই উক্তি যথার্থই।

শ্রীশ্রী মা তাঁর এই লীলা সঙ্গিনীর সঙ্গে কত মধুর লীলা করেছেন তার অন্ত নেই।

ঢাকা শাহবাগে অবস্থানকালীন ঘটনা। কীর্তনে ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীমার সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ করার খেয়াল হল। কিন্তু জগজ্জনীকে কে পায়ের ধূলা দেবে? তাতে যে পাপ ও অপরাধ হবে। ভাবের মধ্যেই মা কান্না জুড়লেন। কেউ পায়ের ধূলা দিতে না চাওয়ায় বাবা ভোলানাথ মাকে নিজের পায়ের ধূলা নিয়ে শান্ত হতে বললেন। নিজ পদধূলি নিয়ে মা শান্ত হলেন। সেই সময়ে পাশের ঘরে দিদি মায়ের এই অবস্থা দেখে ভাবছিলেন— "মা যখন পায়ের ধূলা না নিলে থাকবেন না বলছেন তখন যা থাকে কপালে আমার কাছে এলে আমি মাকে বাধা দেব না। মা যা করবেন, তাতে মঙ্গলই হবে।" পরে মা বললেন, "আজ আমাকে পায়ের ধূলা দিলে, আমিও সকলকে পায়ের ধূলা দিতাম। কিন্তু এই শরীরকে কেউ পায়ের ধূলা দিল না।" দিদি তখনই মাকে বললেন, "একজন ছিল, যে বাধা দিত না।" মা বললেন, "তা এই শরীর জানত বলেই ঐদিকে যাওয়া হয়নি।" যাঁকে প্রাণ-মন-জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করেছেন সেই প্রেমাস্পদা মায়ের তুষ্টি সাধন ও তাঁর শরীর রক্ষাই যাঁর একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য, তাঁর কাছে নিজস্ববোধ অতি তুচ্ছ,

মঙ্গল-অমঙ্গল ভাবনা তো দূরের কথা। এই নিঃস্বার্থ নিষ্কামপ্রেম, এরূপ মধুর লীলা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরাধিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আর একবার শ্রীশ্রী মা কাশীতে আছেন আপন ঘরটিতে নিজ খেয়ালে। দিদি মায়ের অপেক্ষায় বারান্দাতেই রয়েছেন। হঠাৎ দিদির মনে হল, মা জল পান করবেন। মাকে জল দেওয়া দরকার। অমনি জলের গেলাস নিয়ে দিদি মায়ের কাছে ঘরে উপস্থিত। দিদিকে দেখামাত্র মা বললেন, "দিদি, জলের প্রয়োজন, কিন্তু বলার খেয়াল আসছিল না, তুই কি করে বুঝলি ?" এই যে পরস্পর ভাব বিনিময় এ তো স্বচ্ছহৃদয় এবং এক ও অভিন্ন সত্তারই প্রকাশ।

দিদির সকল কাজের মধ্যেই সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচিবোধের প্রকাশ দেখা যেত। সামান্য কাজ, ছোটোখাটো কাজের থেকে শুরু করে বিশেষ কাজ বা বড় কাজেও একটা পরিপাটির ভাব, সর্বজন গ্রাহ্যরূপ প্রকাশ পেত। এমন স্বাভাবিক নিখুঁত ছিল যে তা নিপুণ শিল্পীর শিল্পের মতই পরিস্ফুটিত হত। সকল কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও দিদি রন্ধনাদি, ভোগ দেওয়া, যত্ন সহকারে ভোজন করানো শ্রীশ্রী মাকেই হোক বা সাধারণ কোনো মানুষকেই হোক কাজগুলি এমন নিপুণভাবে করতেন যা আমাদের কাছে ছিল আয়াসসাধ্য ও সাবধানসাধ্য। এমন কি অসুস্থ অবস্থার

মধ্যেও দিদির ঐ নিপুণতা ও আন্তরিকতার অভাব হয়নি।

এ সকল কার্য্য ছাড়া দিদির মধ্যে পরোপকার ও পরার্থপরতা গুণটিও ছিল। কারো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা, কারো লেখাপড়ার ব্যবস্থা, কারো থাকা-খাওয়া জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা, যেভাবেই হোক কারোও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এগুলি দিদি প্রাণপণ প্রচেষ্টায় করতেন। কারো দু:খ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। মায়ের অনেক ভক্ত এর জন্য দিদির কাছে ঋণী। কলকাতার এক বিশেষ ভক্ত একবাক্যে স্বীকার করেছেন, তাঁর জীবনে যা কিছু, তার মূলে মাতৃ কৃপা ও দিদির প্রচেষ্টা আর সহযোগিতা রয়েছে।

মাতৃ লীলাসঙ্গিনী দিদির পূত চরিতাবলী শ্রীশ্রী মায়ের ব্যক্ত লীলা প্রকাশ সহায়ে যতটুকু জানতে পারি তাই আমাদের সম্বল। কারণ দিদিকে জানা বা বোঝা আমাদের পক্ষে দুষ্কর। এমনই গুপ্ত রেখেছিলেন দিদি নিজেকে। তাই যিনি সর্বতোভাবে নির্বিচারে 'মাভৈ:' ভাবটি নিয়ে নিজেকে মাতৃচরণে সমর্পণ করে সারাটি জীবন কাটিয়ে গেলেন, তাঁর স্বরূপ জানতে বা বুঝতে গেলে শ্রীশ্রী মায়ের দিদি সম্পর্কে উক্তিটিই যথেষ্ট। শ্রীশ্রী মা তাঁর লীলাসহচরী দিদির স্বরূপটি নিজেই প্রকাশ করেছেন। এর অতিরিক্ত কিছু ভাবা আমাদের দু:সাধ্য ও বাতুলতা মাত্র।

একবার শ্রীশ্রী মা বিন্ধ্যাচল আশ্রমে উপরের বারান্দায় আপন খেয়ালে ঘুরছেন। দিদি রমাদিকে মায়ের কাছে রেখে নীচে গিয়ে ভোগের ব্যবস্থা করছেন। হঠাৎ মা রমাদির কাছে এসে দিদির পড়ে থাকা কাপড়গুলি ধুয়ে আনতে বললেন। রমাদি মায়ের আদেশে কাপড়গুলি ধোয়ার সময় ভাবছেন, মা দিদির কাপড় ধুয়ে দিতে বললেন, মা নিজের কাপড় তো ধুতে বললেন না। যাই হোক মায়ের আদেশে কাপড়গুলি ধুয়ে উপরে এসে দেখলেন বিন্ধ্যাচলের সহজ স্বাভাবিক নীরব সৌন্দর্য্যে মা নিজের সৌন্দর্য্য মিলিয়ে দিয়ে সেইভাবেই আপন খেয়ালে ঘুরছেন। কিন্তু ভাবটি যেন কেমন গম্ভীর। রমাদি ভক্তি বিভোর ভাবে নীরবে মাকে দেখছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন মা বলছেন, "যেই মা সেই দিদি, যেই দিদি সেই মা।" দিদি সম্বন্ধে মায়ের এই সেই উক্তি।

দিদি মায়ের পরিব্যাপ্ত সেবায় একনিষ্ঠভাবে নির্বিচারে নিজেকে নিয়োজিত করে আপন আচরণের মধ্য দিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনই তাঁর স্বরূপের পরিচয় বহন করে। তাঁর জীবনই এক বিরাট শাস্ত্র, এক অনুসরণীয় মহান আদর্শ। তাকে অনুকরণ নয়, তাকে অনুসরণই তাঁকে উপলব্ধির প্রকৃষ্টতম উপায়।

এই দিদি শ্রীশ্রী মায়ের কত অন্তরঙ্গ। পরস্পরের কথোপকথন, যেন দুই বন্ধুর অন্তরের গভীর ভাব বিনিময়,

হাসি আর আনন্দের স্রোত। দিদি মধ্যে মধ্যে মাকে বলতেন, "মা, তুমি যে কি বুঝে উঠতে পারি না। তোমার অদ্ভুত ভাবলীলা দেখে কখনও মনে হয় তুমি রাম, আবার ভাবি না শ্রীকৃষ্ণই হবেন। তোমার ভাব মাধুর্য্য অপার। কি করে তুমি আমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ হয়ে যাও, তাও বুঝি না। কারণ তখন ভুলে যাই তোমার আসল স্বরূপ। তোমার বিভিন্ন ভাবের খেলা যারা না দেখেছে তারা কি করে বুঝবে, তুমি কত রসময়।" দিদির এসব কথায় শ্রীশ্রী মা খুব হাসতেন, যা দেখার মত।

দীর্ঘ অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীশ্রী মায়ের কাছ থেকে তখন দিদি দূরে। মাতৃবিরহের অসহ্য কষ্ট, আর রোগকষ্ট তো আছেই। এই দুই প্রকার কষ্টে ও ভীষণ জ্বালাতেও দিদিকে ধৈর্য্যচ্যুত বা রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে দেখা যায়নি। অনেকে দিদির কষ্ট দেখে শ্রীশ্রী মায়ের কাছে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছেন ও বলেছেন, "দিদি, আপনার পূর্ব সিংহমূর্তি দেখতে চাই।" দিদি তখন স্বাভাবিকভাবে বলেছেন, "যিনি রোগ দিয়েছেন, সকল সুব্যবস্থা করেছেন, ধৈর্য্যশক্তি তিনিই দেবেন, আর প্রয়োজনে তিনিই সুস্থ করবেন। তাঁর যা খেয়াল।" এমনই মাতৃ সমর্পিত প্রাণ। এভাবে দিদি যেমন সব কিছু মায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে মাতৃনির্ভর ছিলেন, তেমনি শ্রীশ্রী মাও দিদিকে আনন্দ দেওয়ার জন্য ঘরে গিয়ে দিদির কাছে বসা,

কথা বলা, দিদিকে হাসানো, এসব করতেন।

শেষের দিকে দিদির মধ্যে অন্তর্মুখী ভাবটি যেন ঘনীভূত হয়ে আসছিল। বাইরের ব্যবহারেও শিথিলতা প্রকাশ পেত। পূর্বে যেমন শ্রীশ্রী মা দিদির কাছে এলে অল্প সময়ের মধ্যেও মায়ের সব দিকটা জেনে নিতেন বা আনন্দের প্রকাশ দেখা যেত, শেষে তা ছিল না। মায়ের কাছে তখন দিদির দীর্ঘ সময় ধ্যান মগ্ন ভাবটিই প্রাধান্য পেত। এরূপ ভাবের প্রকাশে শ্রীশ্রী মা বলেছিলেন, "দিদির তাকানোটা এ শরীরের জন্য ভাল।" কারণ শুদ্ধ ভাবই তো মায়ের শরীরের আহার। শ্রীশ্রী মাও একথাই অনেকবার বলেছেন। দিদি তখন একেবারেই মা-ময়ী।

কনখল আশ্রমে দিদি অসুস্থ। শ্রীশ্রী মায়ের শরীরও আমাদের দৃষ্টিতে সুস্থ নয়। দিদিকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। দিদি শান্ত ভাবটি নিয়ে মায়ের দর্শন করে চুপচাপ চলে এলেন। সেবিকা তুলসীর দিদির এই আচরণ বিসদৃশ লাগায় জিজ্ঞাসা করল, "দাদাভাই, মায়ের কাছে গেলেন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না, মা, কেমন আছ ?" দিদির সংক্ষিপ্ত অথচ গম্ভীর উত্তর, "মায়ের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার চলে কি ?" বস্তুত: দিদি প্রকৃত মাতৃগত প্রাণা, মাতৃ সাধনবলে দিদি এমন স্থিতিতে পৌঁছে গেছেন যা শ্রীশ্রী মায়ের কথায় 'চরম পরম' অবস্থা, যা আমাদের সাধারণ মানুষের ধরা সম্ভব নয়।" "অশব্দম্ অস্পর্শম্ অব্যক্তম্

অরূপম্” যা, তাই নাম রূপ নিয়ে মাতৃরূপে এই পুণ্য ভূমি ভারতে অবতীর্ণা। তাঁর সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কি করে সম্ভব? তারই প্রতিধ্বনি দিদির এই উক্তিতে। কাজেই সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য দিদির এই অবস্থা।

অসুস্থা দিদির চিকিৎসার প্রয়োজন। শ্রীশ্রী মা দিদিকে মিষ্টি করে বললেন— “দিদি, তোমার শরীর ঠিক দেখছি না, দিল্লী গিয়ে ডাক্তার দেখাও, এ শরীরেরও দিল্লী যাওয়ার কথা।” দিদি নীরব। দিদিকে চুপ দেখে মা আবার বললেন,— “দিদি, তুমি কিছু বললে না?” দিদি হাত জোড় করে মাকে জানালেন, “মা, মালিকের উপর কোন কথা চলে? যা আদেশ মানতেই হবে।” দিদি দিল্লী গেলেন। সেখানেও দিদির কোনরূপ অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল না। ঠিক হল বোম্বে যাবেন। দিদি গাড়ীতে উঠছেন। শ্রীশ্রী মা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দিদির দিকে তাকিয়ে। গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে দিদি হাত জোড় করে শিশুর মত জিজ্ঞাসা করলেন— “এখন কি করব?” শ্রীশ্রী মাও নির্দেশ দিলেন, “ডাক্তার যা বলা করা।” মাতৃগতপ্রাণা দিদিকে আর কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না।

শ্রীশ্রী মা বৃন্দাবন আশ্রমে। খবর এল দিদির অবস্থা সুবিধাজনক নয়। খবর পাওয়া মাত্র শ্রীশ্রী মা ব্যবস্থা থাকা না সত্ত্বেও বোম্বে রওনা হলেন। দিদিকে কাশীতে আনা হল। মা বৃন্দাবন ফিরে গেলেন। দিদির মহাপ্রয়াণের পূর্বে

ছয় রাত্রি একটানা মায়ের গাড়ীতে গাড়ীতে না খাওয়া না বিশ্রাম এই অবস্থায় কাটল।

দিদি কাশীতে শরীর ত্যাগ করলেন। শ্রীশ্রী মা তখন বৃন্দাবনে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত দিদির দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল মায়ের ছবির চরণ তলে। দিদির মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রী মা কাশীতে এলেন, কিন্তু দিদির শিবময় শরীরের কাছে গেলেন না, কন্যাপীঠের বারান্দায় বসে অনবরত দিদির কথাই বলে চলেছেন।

দিদি মায়ের মুখ হতে সন্ন্যাস মন্ত্র পেয়ে ছিলেন। পিতা স্বামী অখণ্ডানন্দজী হতেও নীতিবিধি অনুসারে সন্ন্যাস মন্ত্র পেয়েছিলেন। দিদির নাম হল শ্রী গুরুপ্রিয়ানন্দ গিরি। এই সমস্ত কথাও মায়ের মুখ হতে সকলে শুনলেন। শ্রীশ্রী মা সাধু ব্রহ্মচারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন কিভাবে দিদির শেষকৃত্য করতে হবে। এভাবেই রাত কাটল।

প্রভাতের আলো দেখা দিলে কন্যাপীঠের মেয়েরা শিব-স্বরূপা দিদির পূজা করল। নূতন বস্ত্র পরিয়ে দিল। সাধুরা আদরের দিদিকে পাল্কী করে নিজেদের কাঁধে বহন করে নিয়ে গেলেন গঙ্গার ঘাটে। সেখানে বজরা করে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে নিয়ে গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্মস্থিতা গঙ্গা বক্ষে বিসর্জন দেওয়া হল। আশ্রম বাসীরা মাতৃ সান্নিধ্যে এলেন। শ্রীশ্রী মা দিদির বিষয়ে কত কথাই বলে চলেছেন। দিদির

কথা ভিন্ন আর কথা নাই। সর্ব সমক্ষেই মায়ের শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হল — "প্রতিমা বিসর্জন হল।"

জ্যোতির্লোকের অধিবাসিনী দিদি শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য খেয়ালে এই মর জগতে নেমে এসেছিলেন, মর্ত্যলোকের প্রয়োজনে। আবার তাঁরই দিব্য খেয়ালে অন্তর্হিত হলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বপূর্ণ অথচ সুমধুর স্নেহাপ্লুত মূর্তিটি চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে আমাদের হৃদয়ে।

এভাবে শ্রীশ্রী মায়ের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদ দিদির মহতী মানবলীলার অবসান ঘটল।

আমাদের দিদি আজ চির স্মরণীয়া, এক ঘনীভূত স্মৃতি-মূর্তি হয়ে আছেন। এই মহাজীবনের স্মৃতিই এখন আমাদের পাথেয়। আর তাঁকে পূর্বরূপে কখনও পাব না। স্মৃতি! শুধুই স্মৃতি! তবু মধুময়ী।

শ্রীশ্রী মায়ের ও দিদির মধুর লীলার শেষ নাই। কবির ভাষায় — "মধুর তোমার শেষ যে না পাই।" শাস্ত্র বলে "কীর্তির্যস্য স জীবতি।" সুতরাং কীর্তিময়ী দিদি গুরুপ্রিয়া জগতে শ্রীশ্রী মায়ের নাম যতদিন উচ্চারিত হবে ততদিন অমর হয়ে থাকবেন।

সেবিকাশ্রেষ্ঠ, মাতৃগতপ্রাণা,
শতবার্ষিকী জন্মদিনে
শ্রদ্ধাপূর্ণ নম্রচিত্তে প্রণমি
তব শ্রীচরণে।।

দিদির স্মরণে

—ডাঃ ভক্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

'রবি চির-অস্তমিত-অবলুপ্ত প্রগাঢ় তিমিরে,
সর্বত্র জাগ্রত মরু গ্রাসি যত সমুদ্র নদীরে'
অসম্ভব এ কল্পনা, ভয়ঙ্কর, যেমনই দুঃসহ
তব চির প্রয়াণের সম্ভাবনা, তেমনই অসহ।
দুই হাতে মুছি দিছি সেই ছবি সমুখ হইতে,
আজ তা ত ছবি নয়, এ সত্যেরে পারি না সহিতে।
ভয়ঙ্কর দুঃসহ সে কল্পনা সত্য হল আজ,
চলে গেলে বুকে হেনে শোকের এ তীব্রতম বাজ।
তোমা হীন এ ধরণী রিক্ত আজ ধূসর পাণ্ডুর,
তোমা হীন এ জীবন, ছিন্নতার বীণ—নাই কোন সুর।

'বহুজনহিতায়' ত রেখে গেছ তব নানা দান,
জানি তাতে স্নিগ্ধ হবে বহুদিন বহু আর্ত প্রাণ।
কিন্তু গুমরিছে হিয়া তব মূর্তি, তব বাণী লাগি,
দুঃখের পসরা নিয়া, সর্বহারা হয়ে আছি জাগি।
পাইনা কোথাও কিছু, পুরাইতে তব শূন্য ঠাঁই,
স্মৃতির বেদনা ভরা, এ চিত্তেতে সান্ত্বনা ত নাই।
এই দুঃখভার জানি এ হৃদয় হতে নামিবে না,
বুকজোড়া হাহাকার এই কোনও দিন থামিবে না।

জন্ম হতে জন্মান্তরে, যুগ হতে বহু যুগান্তরে,
যদি কভু দেখা পাই আবর্তিব এ আশা সংসারে।

এ বিশ্বাস জাগে মনে — সুনিশ্চয় পাব দরশন,
কোনও দিন, গাঢ় অন্ধকার নাশি আলো: পরশন
হবে মোর, সেই কালে জ্যোতির্ময় তব মূর্তিখানি,
হ'ক সে প্রলয় শেষে, দিবে মোরে চিরশান্তি আনি।

আমাদের দাদাভাই

— ব্রহ্মচারিণী গীতা

ভক্ত ও ভগবানের উদাত্ত মহামহিমময় চরিত্র অনাদি অনন্ত কাল হতে সকলকে আকর্ষিত করে আসছে। ভক্তের পূর্ণ সমর্পণ, দৃঢ়নিষ্ঠা, শ্রীচরণে অনুরাগ, শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস, প্রেম ও সীমাহীন ভালবাসা, ভগবানের অপার করুণা, স্নেহবৎসলতা ও অহৈতুকী কৃপা এই দুই-এর মিলনে আনন্দ-পীযূষ-নির্ঝরিণীর নির্ম্মল মন্দাকিনী সতত প্রবাহিত হতে থাকে। এই অমৃতধারায় অবগাহন করে সেই প্রেমের ধারায় অভিষিক্ত হয়ে আনন্দে মন-ময়ূর নেচে ওঠে। তাই যুগ-যুগ ধরে ভক্ত কবি ভক্ত-ভগবানের এই অমরগাথা গান করে আসছেন।

এমনই এক ভক্তিরসে সিঞ্চিত মাতৃচরণে পূর্ণ সমর্পিত উদাত্ত মহামহিমময় চরিত্রের নাম 'দিদি গুরুপ্রিয়া।' মাতৃভক্তপরিবারে তিনি 'দিদি' বলে পরিচিতা। শ্রীশ্রী মার দেওয়া নাম 'গুরুপ্রিয়া'। 'দিদি' নামও মার দেওয়া। শুনেছি মার আবির্ভাবের পূর্বে মার একটি ভগিনীর জন্ম হয়। কিছুদিন পর তাঁর পরলোক গমন হয়। মা দিদিকে দেখে বলেছিলেন, "এ আমার সেই দিদি।" সেই থেকে মা তাঁকে 'দিদি' বলে ডাকতেন। পূর্বে মা কখনো তাঁকে 'খুকুনী' বলেও সম্বোধন করতেন। মাতাপিতার দেওয়া নাম 'আদরিণী'। আমরা তাঁকে

'দাদাভাই' বলি। শুনেছি এই নামটি নাকি শ্রদ্ধেয়া মৌনীমা দিয়েছিলেন। মৌনীমা কন্যাপীঠের মেয়েদের বলেছিলেন, 'তোমরা গুরুপ্রিয়াদিকে দিদি বলে সম্বোধন কর। দিদি কি সামান্য মহিলার মত? কর্মক্ষেত্রে দিদির তুলনায় কোনো মেয়েতো নাই-ই এমনকি বহু পুরুষও দাঁড়াতে পারবে না। কারণ দিদি হলেন সক্রিয় কার্য্যবহ্ম আর মা হলেন নিষ্ক্রিয় কারণ ব্রহ্ম। মার খেয়াল দিদি কার্য্য রূপে পরিণত করেন। তাই তোমরা দিদিকে 'দাদাভাই' বলে ডাকবে।" সেই হতে কন্যাপীঠের মেয়েরা তাঁকে দাদাভাই বলে ডাকে। ছোটদের তিনি দাদা, আর বড়দের ভাই। এই দুই মিলে দাদাভাই।

আজ আমাদের অতি আদরের দাদাভাইয়ের শুভ জন্মশত বর্ষের মহোৎসব সমাগত হয়েছে।

শাস্ত্রে কথিত আছে মহৎ-এর জীবন চরিত্র বেদের মতই পবিত্র। তাই এই শুভক্ষণে সেই মহাজীবনের পূতচরিতাবলী হতে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজার মতই দাদাভাইয়ের অনন্য জীবন কাহিনীর সাগরে অবগাহন করে সেই অতল গভীর পবিত্র বারিধি হতে কয়েকটি অমূল্য রত্ন আহরণ করে একটি কথার মালিকা রচনা করে দাদাভাইয়ের চরণে অর্পণ করছি।

বাংলা ১৩০৫ সনের ৩০শে মাঘ, (ইং ১৮৯৯,

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি) শনিবার কোনো এক শুভক্ষণে আসামের শিলচরে দাদাভাইয়ের জন্ম হয়। পিতা আসামের শিলচর জেলার সরকারী হাসপাতালের পদস্থ সিভিল সার্জন শ্রী শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় ঢাকা জেলার রাজদীয়া গ্রাম নিবাসী শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁর পঞ্চম সন্তানরূপে দাদাভাই এলেন ঘর আলো করে। কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতেই যেন অন্যান্য শিশুর সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু অমিল পরিলক্ষিত হতে লাগল। মাতা পিতার আদরের দুলালী কন্যা আদরিণী ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। দাদা ভাইয়ের বড় চারজন ও পরেও তিনজন ভাইবোন ছিলেন। কিন্তু দাদাভাই সকলের নয়নের মণি ছিলেন।

বাল্যকাল হতেই তাঁর ত্যাগের দিকটি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল। সাধারণ মেয়েরা যেমন সাজতে গুজতে ভালবাসে দাদাভাই কিন্তু সেই সব শৈশব হতেই সযতনে পরিহার করেছেন। প্রায়ই চুল আঁচড়াতেন না। জোর করে হয়তো কোনদিন তাঁর মা চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। এই সবের জন্য বকাবকি করলেও তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পরে দাদাভাইয়ের মুখে শুনেছি যে দাদাভাইয়ের মাথায় চুল না আঁচড়াবার জন্য উকুন হয়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলা হতেই দাদাভাই স্তব স্তোত্র পাঠ করতে ভালবাসতেন। তখন মাথা হতে গা বেয়ে হয়তো উকুন পড়ল, তিনি সেটিকে আঙ্গুল

দিয়ে টিপে ধরে থাকতেন। তখন মারতেন না, কারণ পাঠের সময় প্রাণীবধ হবে।

ধীরে ধীরে শিশুকন্যা আদরিণী এগারো বছরের একটি কিশোরী বালিকায় পরিণত হলেন। পিতা শশাঙ্কমোহন কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বিবাহ কে করবে? কন্যা তো বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। একরূপ জোর করেই কন্যার অমতেই পিতা, ঢাকার রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সাবডেপুটির) সঙ্গে সেই সময়ের সমাজের প্রথা অনুযায়ী বিবাহ সংস্কার মাত্র করালেন। কিন্তু বিবাহিত জীবন তিনি আদৌ যাপন করলেন না। পরে দাদাভাইয়ের মুখে আমরা শুনেছি তিনি বলেছেন, "ছেলেবেলায় আমি ভীষণ লাজুক ছিলাম। পুরুষ অথবা স্ত্রী অপরিচিত কাউকে দেখলেই খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। যখন মা, বাবা অনেক বকাবকি করে মেরে ধরেও কিছুতেই শ্বশুর গৃহে পাঠাতে পারলেন না তখন আমারই বয়েসী আমার কয়েকটি বান্ধবীকে আমাকে বোঝাতে পাঠাতেন, তারা এসে আমাকে বলত, তোমার লজ্জা করে না? তুমি এত বড় হয়েছ, বিয়ে হয়েছে, তাও তুমি মা বাবার কাছেই থাক? এই কথা শুনে আমিও তাদের জবাব দিতাম যে 'তোমাদের লজ্জা করে না? যে মাতা পিতা জন্ম দিয়েছেন, এতখানি বড় করেছেন, তাঁদের ছেড়ে অপর

একজন অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে তার বাড়ীতে যাও ? এতে তোমাদের লজ্জাই হওয়া উচিত। এই কথা শুনে তারা হেসে চুপ করে চলে যেত।” যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে সমাজে মেয়েদের বিশেষ করে অভিজাত পরিবারের মেয়েদের এইরূপ পতিগৃহে না গিয়ে স্বাধীন ভাবে ধার্মিক জীবন যাপন করা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তখন ‘আশ্রম’ শব্দটির সম্বন্ধে লোকেদের খুব ভাল ধারণা ছিল না। সেই সময়ে স্বভাবত: লজ্জাশীলা ঐ কিশোরী কন্যাটিকে এই সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস কে দিয়েছিল ? তিনি যে আজন্ম ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। সহজাত বৈরাগ্য তাঁর অঙ্গের ভূষণ ছিল। তাই আমরা দেখি দাদাভাই-ই সর্ব্বপ্রথম সে সময়ের সমাজকে দেখালেন যে মেয়েরা বিবাহ না করেও স্বাধীনভাবে ত্যাগময় জীবনযাপন করতে পারে।

পরে মার কাছে এসে তিনি মায়ের নির্দেশে চুল কেটে ফেলেন ও চুল পাড়ের কাপড় এ্যালা মাটিতে রঙিয়ে পরেন। তিনি পূর্ণ ব্রহ্মচারিণীর সাজে সজ্জিত হলেন। আজ কন্যাপীঠে ব্রহ্মচারিণীরা যে এই ধার্ম্মিক জীবনের ব্রতে ব্রতী হয়েছে তার সৃষ্টিকর্ত্রী দাদাভাই। তিনিই এই পথের প্রথম দিশারিণী। তাই তাঁর মহানির্ব্বাণের পর মা কন্যাদের বলেছিলেন, “কাঁদছ কেন ? তোমরা তো দিদিরই সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে তো দিদিকেই দেখতে পাচ্ছি।” দাদাভাইয়ের এই কন্যাদের জন্য ত্যাগময় জীবনের আদর্শ আজ অন্যান্য

আশ্রমেও গৃহীত হয়েছে দেখতে পাই।

কন্যা আদরিণী যখন কিছুতেই সংসার করবেন না তখন পিতামাতা হাল ছেড়ে দিলেন। পিতা শশাঙ্ক বাবু যাবতীয় সংসারের কাজকর্ম কন্যার উপর চাপিয়ে দিয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হলেন। কন্যাও নিপুণভাবে সংসার পরিচালনা করতে লাগলেন। মাতা পিতার সেবা করেন, মার প্রতিটি কাজে সাহায্য করেন। দাদাভাই নিজের মার কাছেই কাজের নিপুণতা শিখেছিলেন। আর তিনি ছোট ভাই বোনদের স্নেহ যত্নে মানুষ করতে লাগলেন। ছোট ভাই বোনেরাও তাঁর বড় অন্যান্য ভাই বোন থাকা সত্ত্বেও তাঁকেই 'বড়দি' বলে.ডাকত।

সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে দাদাভাই অবসর সময়ে বই পড়তে বসতেন। বাড়ীতেই একটি লাইব্রেরীর মত ছিল। যদিও দাদাভাই সেই সময় অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পড়া খুব বেশী করতে পারেন নি, তবু বঙ্গ সাহিত্যে এমন গ্রন্থ খুব কম আছে যা তিনি পড়েন নি। অতুল প্রসাদ ও ডি.এল. রায়ের গান তিনি খুব ভাল আবৃত্তি করতেন। স্মৃতি শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। বঙ্কিম, শরৎ, নবীন, হেমচন্দ্র সকল সাহিত্যই তাঁর কণ্ঠাগ্রে ছিল। পরে আমরাও দাদাভাইয়ের মুখে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। তিনি কবিতা খুব সুন্দর আবৃত্তি করতে পারতেন।

একবার দাদাভাই কাশীতে গরমের ছুটিতে ছিলেন।

তাঁর দোতলার ঘরে আমরা সব রোজ দুপুরে তাঁকে ঘিরে বসতাম। তিনি একটির পর একটি কবিতা 'সঞ্চয়িতা' হতে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি এমন সুন্দর করে শোনাতেন যে আমাদের চোখে জল এসে যেত। 'জুতা আবিষ্কার', 'পূজার সাজ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' এই কবিতাগুলি খুব শোনাতেন। আমরাও মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। শ্রী কিরণ চাঁদ দরবেশজীর 'মন্দির' হতেও অনেক কবিতা শোনাতেন। আবার বাচ্চাদের নীতি ও উপদেশ পূর্ণ ছড়া বা হাসির ছড়াও শোনাতেন। বিশেষত: আমি দাদাভাইয়ের মুখে কবিতা শুনতে খুব ভাল বাসতাম। তাই দাদাভাই কোনো কবিতা মনে এলে আমাকে শোনাবার জন্য মনে করে রাখতেন। যে সামনে থাকত তাকে বলতেন, "মনে করিয়ে দিস্ গীতাকে এই কবিতাটি শোনাতে হবে।"

পুণাতে কিছুদিন মা আমাকে দাদাভাইয়ের কাছে রেখেছিলেন। রাত্রিতে আমি দাদাভাইয়ের কাছেই শুতাম। তখন প্রায় রাত দুটো অবধি রাত জেগে দাদাভাই আমাকে কবিতা শোনাতেন আর আমিও বিছানায় শুয়ে শুয়েই কিছু কিছু লিখে নিতাম। তারপর এমন হয়েছিল যে দাদাভাইর ঘরে না শুলে আর ঘুম আসত না। আমি দাদাভাইকে অন্য ঘর হতে উঠে গিয়ে রাত্রিতে বলতাম, "দাদাভাই ঘুম আসছে না।" দাদাভাই বলতেন, "তুই এইখানেই শুইয়া পর।"

দাদাভাইয়ের বাংলা ভাষার উপর অদ্ভুত দখল ছিল। তাঁর হাতের লেখাও সুন্দর ছিল। দাদাভাইয়ের অমূল্য অবদান বাংলা ভাষায় ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী" গ্রন্থাবলী।

দাদাভাইয়ের সবে মাত্র তখন মাতৃবিয়োগ হয়েছে। ছোট ছোট ভাই বোনেদের অতি যত্নে লালন পালন করেন, আর পিতার সেবা শুশ্রূষা করেন। বোধ হয় সেটা ১৯২৬ সন হবে। ঢাকায় শাহবাগে শ্রীশ্রী মা আছেন। পিতা শশাঙ্কমোহন বন্ধুদের কাছে মার কথা শুনে মার দর্শন করতে গেলেন। পরে মাতৃনির্দেশে ও কন্যার আগ্রহ দেখে কন্যাকেও মার চরণে নিয়ে গেলেন। মা প্রথম দিনই দাদাভাইকে দেখে বলেছিলেন, "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" যেন নিত্যলীলার সহচরীকে দেখে মায়ের এই অমোঘ পরিচয়ের অপূর্ব অভিব্যক্তি। দুজনেই দুজনকে অতি পরিচিতের মত গ্রহণ করলেন।

তারপর ১৯৩১ সনে পিতা পুত্রী দুজনেই মায়ের দুর্নিবার আকর্ষণে ঘর ছাড়লেন। পিতা শশাঙ্কমোহন উত্তরকালে মাতৃ পরিবারে স্বামী অখণ্ডানন্দজী নামে পরিচিত হলেন; আর কন্যাটি হলেন 'দিদি গুরুপ্রিয়া'। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধারণ-অসাধারণ সকলেরই তিনি ছিলেন আদরের 'দিদি'।

মার কাছে আসার পর আমরা দেখতে পাই দাদাভাই যেন নিজেকে পূর্ণ ভাবে মাতৃচরণে সমর্পণ করে দিয়েছেন। এখন হতে তাঁর লক্ষ্য হল একমাত্র মায়ের সেবা। মা কিসে খুশী হবেন তাই তাঁর করণীয়। মার প্রতিটি বাণী তাঁর কাছে বেদের মন্ত্র। মায়ের আদেশ পালনই হল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। দাদাভাইয়ের এই নির্বিচারে আদেশ পালনে কখনো কখনো হাস্যকর পরিবেশেরও সৃষ্টি হত। কেউ কেউ বলতেন যে মা যদি বলেন, 'দিদি, আজ সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠেছে" তবে দিদি বলবেন, "হ্যাঁ মা, সূর্য্য পশ্চিম দিকেই উঠেছে।" এই কথা শুনে দাদাভাই বলেছিলেন, "মার কাছে প্রার্থনা কর যেন এমনই বলতে পারি।" তখন দাদাভাই একাই মার সমস্ত সেবার কাজ করতেন। এখনকার মত এতলোক তো ছিল না। আবার যাঁরা মার দর্শন করতে আসতেন তাঁদেরও তিনি রান্না করে পরিবেশন করে খাওয়াতেন।

দাদাভাইয়ের সাধনা আরাধনার যা কিছু লক্ষ্য ছিল শ্রীশ্রী মায়ের ঐ চরণ দুখানি। গুরু ও ইষ্টের একই শ্রীবিগ্রহে ঐ সুমহান প্রকাশ।

আমরা দেখেছি বাসন্তী পূজা অথবা দুর্গাপূজা বা যে কোনো পুণ্য পর্বে দাদাভাইয়ের জন্য একটি পূজার থালা সাজানো হত। তাতে ফুল, বেলপাতা, দুর্বা, চাল, চন্দন প্রভৃতি থাকত। দাদাভাই মার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতেন। সুযোগমত মায়ের চরণে ফুল, বেলপাতা, চন্দন

দিয়ে অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করতেন। এই ছিল দাদাভাইয়ের পূজা। অন্য কোন দেবদেবীকে আমরা দাদাভাইকে পূজা করতে দেখিনি। প্রতিদিন সন্ধ্যা সমাপন করে দাদাভাই মায়ের চরণরজ ও চরণামৃত গ্রহণ করতেন। পরম শ্রদ্ধেয় ভাইজী বলেছেন, "যারা মায়ের চরণ আশ্রয় করেছে, তাদের আধ্যাত্মিক পথে আর অন্য কোনো আশ্রয় বা অবলম্বনের আবশ্যকতা নেই।" ভাইজীর এই বাণীর মূর্ত প্রকাশ দাদাভাইর মধ্যে দেখতে পাই।

১৯৩৬ সনে শ্রীশ্রী মা ও বাবা ভোলানাথের উপস্থিতিতে তারাপীঠে দাদাভাইর বৈদিক রীতিতে পৈতা হয়। এরও আগে ১৯৩১ সনে সিদ্ধেশ্বরীতে দাদাভাই শ্রীশ্রী মার হাত হতে গেরুয়া বস্ত্র ও দণ্ড লাভ করেন। যদিও এই কথা তখন কাউকেই প্রকাশ করা হয়নি। দাদাভাই সন্ন্যাস মন্ত্রও মার কাছ হতেই প্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধে মা বলেছেন, "ভাইজীর মত দিদিও পেয়েছিল। এই শরীরের মুখ হতে আপনা হতেই সন্ন্যাস মন্ত্র বের হয়েছিল। তা দিদি নিয়ে নিয়েছে। আর বলেছে যে আমার হয়ে গেছে। তখন আমি বললাম, গুরুপ্রীতি বলব ? না গুরুপ্রিয়া ? প্রীতি ও প্রিয়াতো একই কথা, তা বলল—না মা প্রিয়াই থাকুক। নাম হল গুরুপ্রিয়ানন্দ গিরি। দিদি লোকের সামনে নিজেকে বড় করতে চাইত না। ওই নামটা না বলে গুরুপ্রিয়াদেবী এই নামই হল।"

দাদাভাই পরে অখণ্ডানন্দ স্বামীজী (পিতা) হতেও সন্ন্যাস মন্ত্র পান। মা বলেছেন, "দিদি অখণ্ডানন্দজী হতেও প্রাপ্ত। যে নীতিতে সন্ন্যাস হয় দিদি স্বামীজীর মুখ হতেও সন্ন্যাস নিয়মবিধি সহ পেয়েছে।"

কিন্তু দাদাভাইয়ের গুপ্ত সন্ন্যাসের কথা তখন কাউকেই প্রকাশ করা হয়নি। তাই আমরা দাদাভাইকে বহু বছর পীতবস্ত্রই ধারণ করতে দেখেছি। পরে মাতৃনির্দেশে দাদাভাই গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করেন। গৈরিক বসন পরিহিত তাঁর সেই গৌরবর্ণ শান্ত সমাহিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারাটি এবং শিশুসুলভ প্রাণখোলা হাসিটি চিরদিন আমাদের মানস পটে অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

দাদাভাই ছিলেন আদর্শ কর্মযোগী। শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ, শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ, অখণ্ড সাবিত্রী মহাযজ্ঞ, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ ও শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী চিকিৎসালয় এই সবেরই মূলে ছিলেন দাদাভাই।

কাশীর আশ্রম সম্বন্ধে মা বলেছেন, "এই আশ্রম তো সব দিদি করেছে। এই শরীর যখন নৌকায় থাকত ওপারে, স্বামীজী এদিকে দুধ নিতে আসত। এই জায়গা দিদির খুব পছন্দ হল। নিয়েই ছাড়বে। টাকা পয়সার কোনো ব্যবস্থা নেই। কেউ একবার কাগজে মোড়া ২০ হাজার

না ২৫ হাজার টাকার একটা তোড়া দিল। দিদি সেটাকে একটা কাপড়ে জড়িয়ে বিছানায় বেঁধে ফেলে ট্রাকে উঠে বসল। দিদির পাশে কে বসল না বসল কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এখানে এসে আমাকে বলল, 'মা ওটার মধ্যে এই জিনিষ আছে।' এমন কর্মী ছিল দিদি। মেয়েদের মধ্যে এরকম কর্মী দেখা যায় না। বাসন্তী দেবী, সী.আর দাসের পত্নী এই মেয়েকে চেয়েছিল। অনেকেই এই রকম কর্মী মেয়ে দেখে নিতে চেয়েছিল। দিদির কাজ দিদি করে গেছেন। সাধুদের জন্য আশ্রম, মেয়েদের জন্য স্থান। মেয়েদের কল্যাণ চাইত দিদি।"

বড় বড় শেঠেরা, মাতৃভক্ত বিড়লা, ডালমিয়া, সিংহানিয়া, জয়পুরিয়া, মোদী, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি সকলেই দাদাভাইকে নিজেদের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ করতেন। দাদাভাইও কন্যাপীঠ বা আশ্রমের জন্য প্রয়োজন মত ভগিনীর অধিকারে তাঁদের কাছে আবশ্যকীয় বস্তু চাইতে কিছু মাত্র লজ্জাবোধ করতেন না।

অসুস্থ অবস্থায়ও মা দাদাভাইকে যে কোনো কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন যে দিদি ঠিক করিয়ে নেবে। আমরা দাদাভাইকে মোড়ার উপরে বসে লোকেদের খাওয়াতে দেখেছি। কখনো কখনো মার কথামত দাদাভাইকে মার রান্না বা অতিথিদের রান্না করতে দেখেছি। আমরা দেখতাম দাদাভাই পরের দিন কি কি করতে হবে বা মাকে কিছু

বলতে হবে একটি কাগজে সব নোট করে টেবিলে রেখে দিতেন, যাতে মার আদেশ পালনের লেশ মাত্র ত্রুটি না হয়। পরের দিন সেই কাজগুলি করে ফেলতেন। কোনো অসুবিধা হলে, আমরা যদি বলতাম, "দাদাভাই, কাল অথবা পরে করে দেব।" দাদাভাই বলতেন, "না, এখনই করে ফেল। কোনো কাজ ফেলে রাখতে নাই।" আর বলতেন—

"কাল করৈ সো আজ করো, আজ করৈ সো অব।
পলমে পরলয় হোগী বহুরী করৈ গা কব।"

দাদাভাই ছোট ছোট জিনিষও গুছিয়ে রাখতেন। কোনো জিনিষ নষ্ট করা পছন্দ করতেন না। এক টুকরো কাগজ বা এক টুকরা দড়িও আমাদের হাতে দিয়ে ঠিক করে রাখতে বলতেন। আবার তা মনেও রাখতেন। কাজের সময় তা চেয়ে নিতেন।

দাদাভাইর চিরদিনই খাওয়া দাওয়া খুব কম ছিল। পাতে যদি একটি সবুজ লঙ্কাও পড়ত, তা উঠিয়ে রাখতেন ও বলতেন, "ভিক্ষার জিনিষ ফেলতে নেই। কাউকে দিয়ে দিও।" শুনেছি যে দাদাভাইর মা রন্ধন শিল্পে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। নানা প্রকারের মিষ্টি নিজের ঘরে তৈরী করতেন। কিন্তু দাদাভাই ঐ সমস্ত কিছুই মুখে দিতেন না। দাদা ভাইয়ের প্রিয় আহার্য্য ছিল ভাতের সঙ্গে পাতলা মুসুরীর ডাল, আর সঙ্গে আলুসিদ্ধ অথবা আলুভাজা, আর কখনো পাতলা

দুধের সঙ্গে একটু আখি গুড়। তাঁর জল খাবার ছিল সাবুদানা ভেজানো আর সঙ্গে একটু চিনি। নারকেল টারকেল কিছুই না। আমরা দাদাভাইকে দুধ সাবু খেতে দেখেছি। অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতাম, "দাদাভাই, আপনি শুধু সাবুই ভাল বাসেন ?" উত্তরে তিনি বলতেন, "ছেলেবেলায় আমি শুধু সাবুই জলখাবার খেতাম। একটি বাটিতে একটু সাবু ভিজিয়ে ঢেকে রেখে লাইব্রেরীতে পড়তে বসতাম। পড়া শেষ করে উঠে সেই সাবু একটু চিনি দিয়ে খেয়ে নিতাম।"

দাদাভাই বলতেন যে তাঁর পিতা কখনো যদি তাঁকে একটু ভাল দরের পাতলা কাপড় এনে দিতেন, তাহলে তিনি কেঁদে আকুল হতেন। তিনি মোটা কাপড় পরতে ভাল বাসতেন। দাদাভাই ধনীর সন্তান হয়েও বাল্যকাল হতেই আহারে, বিহারে, বসনে, ভূষণে কোনো প্রকারের বিলাসিতা পছন্দ করতেন না।

দাদাভাই বসে-বসে কারো বিষয়ে আলোচনা করা বা কারো নিন্দা করা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। বলতেন, "তোমাদের পরনিন্দা পরচর্চা করলে মুখে বুঝি খুব মিষ্টি লাগে? এই প্রসঙ্গ বন্ধ করে এখন একটু মার কথা বলতো।" আমাদের কোনো আলাপ আলোচনা দাদাভাইর কানে গেলে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন। সাধারণ বিষয় বলে আমরা যদি বলতাম "কিছুনা", দাদাভাই তখনি বলতেন, "তোমরা এরকম ভাবে বলবে না। এটাও

কিন্তু মিথ্যা কথা।”

আমার সঙ্গে দাদাভাইয়ের কর্মের দিকটির খুব একটা পরিচয় হয়নি। কারণ আমি যখন আশ্রমে এসেছি তখন দাদাভাই অসুস্থ। কাজেই আমরা কেবল দাদাভাইর স্নেহ ভালবাসাই পেয়েছি। শুনতে পাই দাদাভাই খুব রাশভারী লোক ছিলেন। বিরাট মাপের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ চেহারা, দরাজ গলা, অদ্ভুত পৌরুষ ভীড়ে মায়ের শরীর রক্ষা ইত্যাদির জন্য আবার কঠোরতার আবরণে নিজেকে আবৃত করে রাখতেন। দূর থেকেই তাঁকে দেখে সম্ভ্রমে অনেকে ভয়ে পালাত। আমরাও ছোটবেলায় দাদাভাইকে কখনো কখনো রাগ করতে দেখেছি। তখন দাদাভাইর কাছে যেতে খুব ভয় হত।

আমার মনে পড়ে, আমরা তখন দেরাদুনে। আমাদের এক শাস্ত্রীজী সংস্কৃত পড়াতেন। তিনি মজা করে হেসে বলতেন, “দিদিকে পাস যানে মে ডর্ লগতা হ্যায়। উনকী এক ‘হুম’ আবাজ সুননেসে হী শরীর কাঁপনে লগতা হ্যায়। পরন্তু দিদিকে ভীতর বহুৎ প্রেম হ্যায়। হমে কিত্না প্যার সে খিলাতী হ্যায়।” শাস্ত্রীজী দাদাভাইর সঙ্গে নারকেলের তুলনা করে হিতোপদেশের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি শোনাতেন—

“নারিকেল সমাকারা দৃশ্যন্তেহি সুহৃজ্জনাঃ।
অন্যে তু বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ।।”

অর্থাৎ মহাজনেরা বাইরে নারকেলের মতই কঠোর হন। কিন্তু ভিতরটা জলে পরিপূর্ণ। আর সাধারণ মানুষ কুলের মতই বাইরে যতই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলুক ভিতরটা আঁটিই সার, আর কিছুই নেই। পরে শুনেছি মাও বলেছেন, "দিদি নারকেলের মত। ভিতর জলে ভর্ত্তি।" দাদাভাই রাগ করলে, পরে বুঝিয়ে বললে বা অপরাধ স্বীকার করলে সেই মুহূর্ত্তে গলে যেতেন।

আমরা দাদাভাইর স্নেহ, কোমল হৃদয়েরই স্পর্শ পেয়েছি। দাদাভাইয়ের ভিতরে সকলের প্রতি প্রেম, ভালবাসা সমানভাবে ছিল। দাদাভাই তাকেই সব থেকে বেশী ভাল বাসতেন, যে মার কথা শোনে ও মাকে ভালবাসে। দাদাভাইর হৃদয় মাখনের মত কোমল ছিল।

গরীবদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। কত লোককে যে তিনি চাকরী দিয়ে তাদের জীবন নির্বাহের সংস্থান করে দিয়েছেন তার গণনা নেই। শ্রীশ্রী মা বলেছেন, "একবার দিদি ভিক্ষা করে আনছে। কে বলল যে তারা সাতদিন ধরে খায়নি। দিদির কাছে যা ছিল, দিয়ে দিল। আর কাঠ ইত্যাদির টাকাও দিয়ে বলল যে তোমরা সব কিছু এনে রান্না করে খেয়ে নিও। ব্যাস্ দিদি চলে আসল। দিদি যা করার করে চলে এসেছে।"

অপরিচিত জনের সঙ্গে দাদাভাই এমন মধুর স্বরে

'ভাই' বলে ডেকে কথা বলতেন যে তখনই সে দাদাভাইর একান্ত আপনার জন হয়ে যেত। কারণ তিনি যে সকলেরই স্নেহময়ী দিদি। মায়ের ভক্তদের হৃদয়ে দিদির জন্য একটি আলাদা স্থান ছিল। এমনকি আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও দাদাভাইকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। এই সেদিনও দাদাভাইর ড্রয়ারে ইন্দিরা গান্ধীর নিজের জন্মদিনে দাদাভাইকে লেখা একটি চিঠি দেখলাম।

আমাদের যে কত স্নেহ করতেন তা ভাষায় অবর্ণনীয়। আমি আচার্য্য পরীক্ষা পাশের পর পুণায় গিয়েছিলাম। মা বললেন, "গীতা এখন কিছুদিন বিশ্রামে থাকবে।" প্রায় নয় মাস আমি মার সঙ্গে ছিলাম। আমরা ছোটবেলা হতে কন্যাপীঠের নিয়মের মধ্যে মানুষ হয়েছি। তাই প্রথম প্রথম একা একা মার ওখানে খুব সংকোচ হত। কেউ কিছু হাতে উঠিয়ে না দিলে সকাল হতে কিছু না খেয়েই থাকতাম। দুপুরে কাজ সেরে খেতে খেতে বেলা দুটো আড়াইটা বেজে যেত। একদিন দাদাভাই আমাকে ডেকে বললেন, "তোর মুখ ক্যান শুকনা দেখা যায়? তুই সকাল হতে বোধ হয় কিছু খাস্ নাই?" আমি বললাম, "না।" দাদাভাই তখনি কাউকে দিয়ে মার বাড়ী হতে অনেক ফল আনালেন ও আমাকে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন। পরদিন হতে মার বাড়ী হতে আসার সময় আমার জন্য দাদাভাই রোজ ফল

নিয়ে আসতেন ও আমাকে খাওয়াতেন। কিছুদিন পর দাদাভাই কাশী চলে গেলেন। আমি মার সঙ্গে পুণাতে রইলাম। মনে পড়ে আমি দাদাভাইকে চিঠি লিখেছিলাম, "দাদাভাই, আপনি চলে গেছেন, এখন আর কেউ ফল দেয় না।" যেখানেই যেতাম, দাদাভাইকে যদি বলতাম, "দাদাভাই, অমুক জায়গা দেখতে যাব, কখনো নিষেধ করতেন না, ব্যবস্থা করে আমাদের বেড়াতে পাঠিয়ে দিতেন। একবার বৃন্দাবনে দুর্গাপূজা হল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে আমাদের খুব যেতে ইচ্ছা করছে। আমি গিয়ে দাদাভাইকে বললাম। দাদাভাই ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলেন। আজও মনে আছে সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে যমুনার তীরে আমরা খুব আনন্দ করে ছিলাম। আরেকবার দিল্লীতে আছি। ছবিদি প্লেনে দিল্লী হতে কলকাতা যাচ্ছেন। আমি গিয়ে দাদাভাইকে বললাম, "দাদাভাই আমরা ছবিদির সঙ্গে এরোড্রোমে যাব। কারণ আমরা বোম্বের সান্টাক্রুজ দেখেছি বটে, কিন্তু দিল্লীর পালাম দেখিনি। অমনি দাদাভাই দিল্লীর কানুগুহর সঙ্গে আমাদের এরোড্রোমে পাঠিয়ে দিলেন। কিছু না বললেও নিজেও অনেক সময় নতুন জায়গায় গেলে আমাদের বেড়াতে পাঠাতেন। এইরূপ যত আদর আবদার আমাদের দাদাভাইর সঙ্গেই ছিল।

একবার বৃন্দাবনে হলে বসে আছি। হঠাৎ কেউ এসে বলল, "তোমাকে দাদাভাই ডাকছেন।" গিয়ে দেখি দাদাভাই

একটি নতুন ঘড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি যাওয়া মাত্র ঐ ঘড়িটি আমাকে দিলেন। আমি কিন্তু ঘড়ির কথা দাদাভাইকে কিছুই বলিনি। এইরূপে টর্চ দিয়েছেন। ডট্‌পেন যে কত দিয়েছেন তা বলতে পারব না। মাকে বলে মার হাত দিয়ে গরদের কাপড় দিয়েছেন। দাদাভাই সব সময় বলতেন, "তোমাদের যে স্নেহ করি তোমাদের মুখ দেখে করি না। তোমরা যে এই পথ গ্রহণ করেছ, মাকে ভাল বেসেছ, তাই তোমাদের ভালবাসি।"

একবার দাদাভাইর জন্মদিনে দাদাভাইকে প্রণাম করলাম। দাদাভাই আমাকে এই বলে আশীর্ব্বাদ করলেন, "মার প্রতি, ধর্ম্মে লক্ষ্য ঠিক থাকুক, ধীর স্থির সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হও।" দাদাভাই চাইতেন আমরা যেন মাকে তন-মন-ধন দিয়ে ভালবাসতে পারি। সেই দাদাভাইর সর্ব্বাধিক প্রিয় পাত্র হবে। দাদাভাইকে কেউ প্রণাম করে যদি বলতেন, "দিদি, একটু আমার মাথায় হাত দিন।" অমনি দাদাভাই বলতেন, "মাথায় হাত একজনই দেবেন। মা দেবেন।"

দাদাভাইর মধ্যে সব সময় একটি নির্ম্মল আনন্দধারা প্রবাহিত হত। কোনো কারণে মনঃ ক্ষুণ্ণ হলে তাঁর কাছে বসে দুটি কথা বললেই মন হালকা ও প্রসন্ন হয়ে যেত। এ আমি জীবনে বহুবার অনুভব করেছি।

শেষের দিকে দাদাভাই একেবারে শিশুর মত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই দন্তবিহীন মধুর প্রাণখোলা হাসিটি চিরদিন আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। আমাদের দাদাভাইয়ের সঙ্গে একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল। আমি তাঁর ঐ মধুর হাসিটি খুব ভালবাসতাম। অনেক সময় দাদাভাইয়ের হাত ধরে বলতাম, "দাদাভাই, আপনি খুব মিষ্টি।" দাদাভাই বলতেন, "হ এক্ষুনি খাইয়া ফ্যাল।" দাদাভাইয়ের ভাবটি শিশুর মত হয়ে গিয়েছিল। দাদাভাইয়ের মধ্যে অহংভাবের লেশ মাত্র ছিল না। আধ্যাত্মিক পথে যে শিশুর ভাব বহু সাধনা করেও পাওয়া যায় না দাদাভাইয়ের তা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। দাদাভাই গম্ভীর হতে গম্ভীর আবার শিশুর মত সরল ছিলেন। তাই দাদাভাইকে বড় ছোট সকলেই এতটা ভালবেসে ছিল।

দাদাভাইয়ের শ্রীশ্রী মায়ের চরণে পূর্ণ সমর্পণের ভাব অবশ্যই আমাদের অনুকরণীয়। একবার দাদাভাই গোপাল মন্দিরে আছেন। আমি গিয়ে দাদাভাইকে বললাম, "দাদাভাই! কন্যাপীঠের মেয়েরা সকলেই যদি চলে যায়, তবে কন্যাপীঠকে কে দেখবে? আপনি নিয়ম করে দিন যে যারা শাস্ত্রী আচার্য্য পড়বে তারা যেন না যায়।" এই কথা শুনে দাদাভাই আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কি? তোর মার চরণে বিশ্বাস নেই? মার কন্যাপীঠ মাই দেখবেন। আমি শুধু নিষ্কামভাবে কুমারী কন্যাদের সেবা করে যেতে চাই।

যদি মার আদর্শে একটি মেয়েও দাঁড়াতে পারে তবে আমার এই সেবা সার্থক মনে করব।”

একবার মা কন্যাপীঠের কন্যাদের প্রশংসা করে দাদাভাইকে বললেন, “দিদি, তোমার কন্যাপীঠের মেয়েরা এই এই করেছে। সব তোমার জন্যই হয়েছে।” তখন দাদাভাই হাতজোড় করে মায়ের চরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, “সবই ঐ চরণে, ঐ চরণেরই সব।” দাদাভাই এই কথাগুলি এমনই মর্মস্পর্শীভাবে বললেন সকলেই অভিভূত হয়ে গেলেন।

দাদাভাইর ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অদ্ভুত ছিল। এই সুদীর্ঘকাল রোগে ভুগেছেন, কোনোও দিন তাঁর মুখ হতে কোনো যন্ত্রণাসূচক “উ:” “আ:” শব্দ শোনা যায়নি। নীরবে সব সহ্য করেছেন। আমরা তখন ছোট। তবে সব মনে আছে। দাদাভাই কন্যাপীঠের নীচের ঘরে আছেন। দাদাভাইয়ের টাইফয়েড ও নিমোনিয়া দুই-ই হয়েছে। খবর পেয়ে হরিবাবা মাকে নিয়ে কাশী ছুটে এলেন। হরিবাবা দাদাভাইকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি বলতেন, “মা তো অনেক ঊর্ধ্বে। দিদি আমাদের নাগালের মধ্যে।” হরিবাবা এসেই দাদাভাইয়ের জন্য রাম অর্চা আরম্ভ করালেন। হরিবাবা দাদাভাইকে বললেন, “দিদি, তুমি একবার মাকে বল, “মা! আমাকে ভাল করে দাও। তা হলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।” কিন্তু দাদাভাই হরিবাবাকে প্রণাম করে চুপ

করে রইলেন। পরে হরিবাবা চলে যাওয়ার পর বললেন, "হু: মাকে বলব, মা! আমাকে ভাল করে দাও। মার যদি ইচ্ছা হয় ভাল করবেন, না ইচ্ছা হয় না করবেন।" ভয়ংকর অসুখ ও কষ্টের সময়ও যদি কেউ দাদাভাইকে বলত, "দিদি, মাকে খবর দেই?" দাদাভাই তখনি বলতেন, "না না! মাকে খবর দেবে না। মা চিন্তা করবেন।" তাই বুঝি পরম করুণাময়ী কৃপাময়ী মা নিজেই গিয়ে শ্রেষ্ঠ কৃপার অধিকারিণীকে অন্তিম সময়ে বম্বে হতে মুক্তিধামে কাশীতে নিয়ে এলেন।

যে চরণ যুগলের আশ্রয় গ্রহণ করে বহু বছর পূর্বে দাদাভাইর কর্মময় অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ হয়েছিল, শ্রীশ্রী মায়ের ছবিতে সেই চরণ দুখানিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ১৯৮০ সনে ১৬ই সেপ্টেম্বর মুক্তাভরণ সপ্তমী তিথিতে দাদাভাইর আত্মজ্যোতি মাতৃচরণে চিরতরে সমাহিত হয়ে গেল।

শ্রীশ্রী মা বলেছেন, "যারা কাজের জন্য আসে তারা কাজ করে চলে যায়। দিদি তো এই শরীরের কাজের জন্য এসেছিল। কাজ হয়ে গেছে চলে গেছে।"

আজকের এই জন্মশত বর্ষের পুণ্যময় লগ্নে দাদাভাইয়ের চরণে প্রণতি জানিয়ে এই প্রার্থনা জানাই যেন আমাদের জীবনেও মায়ের চরণে অবিচল ভক্তি ও অনুরাগের কুসুম-কলিকা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

"গুরুপ্রিয়াগিরিং বন্দে বন্দে মাতু:পদাশ্রিতাম্।
কন্যাপীঠ প্রসূং বন্দে বন্দে বাণী প্রবাহিনীম্॥

‘স্বে মহিম্নি’

—শ্রী শিবানন্দ

স্বয়ং মহামায়া পরাশক্তি লীলার উদ্দেশ্যে যখন ধরাধামে অবতীর্ণা হন তখন অবতারদের পার্ষদদের মত তিনিও তার লীলা সঙ্গিনীদের ধরাধামে নিয়ে আসেন। পরাশক্তি শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীও এনেছিলেন তাঁর লীলা-সঙ্গীদের। ঐ ভাবে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট-চিহ্নিত কয়েকজন ছিলেন— জ্যোতিষ চন্দ্র রায়, বাবা ভোলানাথ, আদরিণী দেবী প্রমুখ। আদরিণী দেবী অবশ্য ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট লীলা পার্ষদ। পরবর্ত্তিকালে ইনিই হয়েছিলেন স্বনামধন্যা শ্রী গুরুপ্রিয়া দেবী। “গুরুপ্রিয়া” শ্রীশ্রী মায়ের প্রদত্ত নাম। কখনো বা ‘দিদি’ এই সম্বোধনেও তাঁকে আহ্বান করতেন, করে অনন্য সাধারণ মর্য্যাদায় বিভূষিত করতেন।

শ্রী আদরিণী দেবীর আবির্ভাব ঘটেছিল ১৩০৫ সনে আসামের শিলচর শহরে। সেদিন ছিল শনিবার রাত্রির শেষ যামের প্রথমার্দ্ধেই তাঁর প্রাকট্য ঘটেছিল। শোনা যায় তাঁর জন্ম সময়ে অজ্ঞাত কোথাও হতে শঙ্খধ্বনি শ্রুত হয়েছিল। কিন্তু কোথা হতে তা আজো অজ্ঞাত। হয়ত বা সেটাই কোন লীলা পার্ষদের আবির্ভাব সঙ্কেত।

পিতা শ্রী শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন অবিভক্ত বাংলা আসামের সিভিল সার্জন। তিনি ছিলেন পূর্ববাংলার ঢাকার-ই অধিবাসী, কার্যোপলক্ষে তিনি তৎকালে শিলচরে অবস্থান করছিলেন। তিনি ছিলেন উদারচেতা, দয়াবান ব্যক্তি।

ডাক্তার মানুষ। রুগী এসেছে, রোগের বিবরণ শুনে বুঝলেন দুরারোগ্য ব্যাধি, ইনজেকশন আদির ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। ব্যবস্থাপত্র দেখে রুগীর বুঝতে বিলম্ব হল না তা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ, তার সামর্থ্যের অতীত। তিনি তা প্রকাশ করতেই ডাক্তার বাবু একখানি কাগজ লিখে তার হাতে দিয়ে বললেন—এই নাও। যে দোকানের নাম লিখেছি সেই দোকানে গিয়ে এখানা দাও। ঔষধ নিয়ে যাও, পয়সা লাগবে না।" অর্থাৎ তার নিজস্ব দেনা-পাওনার খাতায় জমা হবে। এরূপ ঘটনা তাঁর জীবনে অজস্র।

তখন ইংরেজের আমল। সে যুগে ভারত বাসীর ঐ রূপ উচ্চ পদে কার্য করতে গেলে সকলকেই উর্দ্ধতন পদের শ্বেত-চর্ম বিশিষ্টদের অনুরোধ উপরোধ না করলে চলত না। কিন্তু তিনি স্বার্থের অনুরোধে উচ্চতর কর্ত্তাদের তোষামোদ করাকে আত্ম মর্য্যাদার অপমান বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন— "স্বার্থের খাতিরে ওপর ওয়ালাদের দরজায় হাত কচলানো! সে তো শেয়াল কুকুরের কাজ।" এই ছিলেন পিতা।

জননী শ্রীযুক্তা হরকামিনী দেবী ছিলেন অতিশয় পতি সেবা পরায়ণা। দেব-দ্বিজে ভক্তি তো তার কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। সময়ে হোক্ অসময়ে হোক্ অতিথি, ব্রাহ্মণ অভুক্ত অবস্থায় কদাপিও তাঁর গৃহ হতে প্রত্যাবৃত হয়নি।

এরূপ পিতামাতার গৃহেই এসেছিলেন আদরিণী। তাঁর জীবনেও পিতা-মাতার ঐ সব গুণাবলী পরিলক্ষিত হত। জন্মাবধিই তিনি পরম আদরের। এই কারণেই আমরা দেখি তিনি যেমন আদরিণী হয়ে জন্মেছিলেন, আদরিণী হয়েই বড় হয়েছিলেন, তেমনি জনগণের পরম-আদরিণী হয়েই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

তিনি যে যুগে জন্মেছিলেন, সে যুগে বাঙ্গলা সমাজে স্ত্রী শিক্ষা বর্তমান যুগের ন্যায় এরূপ প্রচলিত এবং সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু তিনি সিভিল-সার্জেনের কন্যা, তার শিক্ষা না হলে কি চলে! সুতরাং যথা সময়ে একদিন পুস্তকাদি নিয়ে তিনি চললেন শিশু শিক্ষা পাঠশালায়। তাঁকে পেয়ে শিক্ষকগণ খুব খুশী। মেয়েটির যেমন মেধা, তেমনই বুদ্ধি। হস্তাক্ষরগুলিও সুন্দর করে গড়া। তার প্রমাণ তো আমরা সর্বদাই পেয়েছি, তাঁর চিঠি পত্রের মাধ্যমে।

পাঠশালাতে তাঁর সম্মান শিক্ষকবর্গের কাছে একদিন আরো বর্ধিত হয়ে গেল কেন সে সম্পর্কে তাঁরই মুখে

‘স্বে মহিম্নি’

একটা গল্প শুনেছি।

একবার স্কুলে পরিদর্শক আসবেন। পরিদর্শক আসার অর্থই হল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক বর্গেরও পরীক্ষা। কারণ তাঁরা তখন দেখবেন, শিক্ষকগণ কেমন লেখাপড়া শেখান। পরিদর্শক আসবেন, সুতরাং আরম্ভ হল ছাত্রছাত্রীদের তালিম দেওয়া। সুরু হল খুব যত্ন সহকারে কবিতা, পাটিগণিতের নামতা কণ্ঠস্থ করান, বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করা ইত্যাদি।

যথাদিনে পরিদর্শক এলেন। যথারীতি ছাত্রদের প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক একটী ছাত্রকে কবিতা কণ্ঠস্থ শোনাতে বললেন। কিন্তু অনেকেই কিছুটা অগ্রসর হবার পর আর বলা আসছে না। এবার এল আদরিণীর পালা।

“পরিদর্শক আমাকে বলেছিলেন, ‘পাড়া-গাঁ’ কবিতাটা শোনাও তো। সেই কবিতাটাই আমার খুব ভালো ভাবে কণ্ঠস্থ ছিল। বড় ভাল লাগে আমার পাড়াগাঁয়ে... আমি গড় গড় করে বলে দিলাম। পরিদর্শক পীঠ চাপড়ে বললেন, ‘খুব ভালো।’ পরদিন থেকে আদরিণী পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আরো আদরিণী হয়ে উঠলেন।

হবার কথাই তো। বেশ কল্পনা করতে পারা যায়, পণ্ডিত মহাশয়ের ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে ছিল সেদিন। কারণ

তার পাঠন ক্রিয়াতে যে ত্রুটি ছিল না, আদরিণীই তা প্রমাণ করেছিল।

বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে, জ্ঞানার্জ্জনের বিষয়ে দিদি চিরকালই ছিলেন অনুসন্ধিৎসু। তাঁর জিতেনদা এম, এ পড়তেন দর্শনশাস্ত্র নিয়ে। দিদি জানলেন দর্শনশাস্ত্র ভগবৎ বিষয়ে জ্ঞানচর্চ্চা। বাল্যাবধিই আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি অনুসন্ধিৎসু। সুতরাং আরম্ভ হল দিদির তাঁকে নানান প্রশ্ন করা। সে সব শুনে জিতেনদা বলেছিলেন, "খুকুনি এসব প্রশ্ন পায় কোথা থেকে ? এ সব তো দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়নের বিষয়।" কথা কটি জিতেনদার বাচনিকই শোনা।

যাক দিদির বিদ্যা শিক্ষা কিছুদিন চলে ছিল। ক্রমে তিনি একাদশ বর্ষে পদার্পণ করলেন।

সে যুগের বাংলার সমাজ। আদরিণী পৌঁছেছে একাদশ বর্ষে, আর কি তাকে অবিবাহিত রাখা যায়। সুরু হল সুপাত্রের সন্ধান। পিতা বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তি, সুতরাং বিলম্ব হল না। দেখতে দেখতে সুপাত্রের সন্ধান এল এবং একাদশ বয়:ক্রম কালেই শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিদি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

অবশ্য বিবাহ ব্যাপারটী যত সহজে লেখা হল তত সহজে নিষ্পন্ন হয় নি। কারণ বিবাহের ব্যাপারে আদরিণীর

প্রচণ্ড অনিচ্ছা। তবুও তিনি বিবাহ বন্ধন স্বীকার করলেন পিতামাতার ইচ্ছা এবং আদেশের জন্যই। সে যুগে আধুনিক কালের ন্যায় ছিল না। এ যেমন একদিক, তেমনি তৎকালীন সমাজে বয়:প্রাপ্ত কন্যাকে অনূঢ়া অবস্থায় গৃহে রাখা রীতি বিরুদ্ধ এবং দুর্নামের বিষয় বলেও বিবেচিত হত। সুতরাং পিতা মাতা তাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম করেছিলেন।

অবশ্য আদরিণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আর একটী কারণ ছিল। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে বাল্যাবধিই দিদির চিত্তবৃত্তি ছিল ভগবদ্‌মুখী। তাঁর সে বৃত্তি শৈশব হতেই লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর পিতামাতা। সাধারণত: দেখা যায় সকল পিতামাতাই আপন সন্তানকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সুখ বা আনন্দ লাভ করেন। সংসার বিরাগী বৃত্তিতে তাঁরা বিচলিত হন। সে কারণেও হয়ত তাঁরা ভেবেছিলেন বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করে আদরিণীকে তাঁদের নিকট ধরে রাখার কথা। এ সব কারণে আদরিণীও অন্য পন্থা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা দেখছিলেন।

বর পক্ষের কন্যা নির্বাচনের জন্য আনাগোনা সুরু হল। আদরিণী স্থির করলেন পাত্রপক্ষ যদি তাঁকে অপছন্দ করেন তবেই এ ব্যাপারে তাঁর রেহাই মিলতে পারে।

পাত্র-পক্ষ "কন্যা দেখার" জন্য উপস্থিত, আদরিণী নিখোঁজ। কোথায় গেল মেয়ে? অনুসন্ধানের পর তাঁকে

মিলল, তিনি তাঁদের শয়ন কক্ষে পালংয়ের তলদেশে আত্মগোপন করে আছেন। অন্য একদিন পাত্রপক্ষের আসার সূচনা পেয়ে কন্যাকে সাজগোজ করিয়ে রাখা হয়েছে। যথা সময়ে দেখা গেল তিনি দোয়াতের কালী কিছুটা গালে, কিছুটা কপালে লেপন করে বসে আছেন। তাঁর মুখেই শুনেছি এ জাতীয় বালকোচিত অনেক আরো ঘটনা।

যাহা হোক তিনি বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু তা বিবাহ্ অনুষ্ঠান মাত্রেই পর্য্যবসিত হ্ল। শ্বশ্রুগৃহে গিয়েও তিনি হয়ে রইলেন অনড়, অটল। অগত্যা তাঁকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে পিতৃগৃহে প্রেরণ করা হ্ল। পরবর্ত্তী এক সময়ে এ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মা বলেছিলেন, "দিদির বিবাহ্ সংসার করার জন্য তো হয় নি, হয়েছিল বিবাহ্ সংস্কার পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে।"

এ ভাবেই দিন অতিবাহিত হতে লাগল। পিতৃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে পিতামাতার সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। সঙ্গে চলল তাঁর অভিলষিত অধ্যায়ন গীতা, রামায়ণ, মহাভারত আদি।

স্বভাবতই দিদি বাল্যকাল হতেই ছিলেন স্বল্পভাষী। অপ্রয়োজনে কথাবার্ত্তা বলা, অকারণে অপরের সঙ্গে মেলা মেশা করাও ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। এ কারণে দিদি বাল্যাবধিই ছিলেন অন্তরাল বাসিনী। দিদির বাচনিকই শোনা

গেছে, "টিকাটুলিতে থাকতে লোকজনের আনা গোনা তো লেগেই থাকত। সিভিল সার্জেনের বাড়ী। কিন্তু আমি কখনো কারো সম্মুখে যেতাম না। যেতে পারতামই না। জানি না কেন। খুব লজ্জা-সংকোচ বোধ হত।" প্রশ্নের উত্তরে দিদি বলে চলেছেন, "বাড়ীতে হয়ত কেউ এসেছে, হয়ত বা বাবা মার সঙ্গে কারো কথাবার্ত্তা হচ্ছে, তখন যদি কোন কারণে মা বা বাবা আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আমি গিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, তাঁদের বক্তব্য শুনেই, একেবারে দৌড়।"

যা হোক, এখন দিদির অখণ্ড অবসর। সুতরাং পিতামাতার সেবায় তিনি সম্পূর্ণ ভাবে গা ঢেলে দিলেন।

পিতা একবার কঠিন ভাবে অসুস্থ হয়েছিলেন। পিতার সর্বশরীরে অসহ্য জ্বালা বোধ হতে লাগল। ডাক্তার বিভিন্ন ঔষধের সাহায্যে সে জ্বালা নিবারণের প্রচেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু জ্বালা উপশমের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। পিতৃসেবাপরায়ণা দিদি সে সময়ে পিতার শয্যার পার্শ্বে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে তাঁর সর্বাঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করতে লাগলেন এবং তারই ফলে সে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটে। মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীদের প্রতিও তাঁর সেবা কার্যের বিচ্যুতি কখনো ঘটে নি।

এ দিকে তাঁর শ্বশুরালয় হতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা

আসতে থাকে, আদরিণীর বিষয়ে কি স্থির হল ? যদি সে সংসার নাই করে, তবে "ডাইভোর্সের" ব্যবস্থা করা হোক ?

দিদিকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন—"যাকে গ্রহণ-ই করা হয় নি। তাকে আবার ছাড়ার প্রশ্ন কোথায় ! পিতামাতার আদেশ পালনের জন্যই বিবাহ, পিতামাতা পালন কর্ত্তা, তাঁদের পরিত্যাগ করে কি পরপুরুষের সঙ্গে থাকা যায়।"

দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল এই ভাবেই। এরই মধ্যে একদিন অকস্মাৎ মাতা পরলোকের পথে পা বাড়ালেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে দিদি ছিলেন স্বল্পভাষী। এই ঘটনা দিদিকে একেবারে মৌনীতে পরিণত করে দিল। চিত্তে তাঁর নেমে এল চরম উদাসীনতা।

এমনই যখন অবস্থা, তখন একদিন দিদি সংবাদ পেলেন পিতা যাবেন এক মাতাজীর দর্শনে। ঢাকা শাহবাগে নাকি এক মাতাজী এসেছেন। এ সংবাদ শোনা মাত্রই দিদি পিতার সঙ্গে যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী সময়ে দিদি বলেছিলেন, "এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। অন্য কোথাও যাওয়া, কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা, এমন কি সাধু মহাত্মাদের দর্শনে যেতেও আমার ভাল লাগত না। অথচ যাঁকে কখনো দেখা তো দূরের কথা, যাঁর নামও

কখনো শুনি নি, তাঁর নিকট যাওয়ার তাঁকে দেখার জন্য কী যেন এক আকুলতা আমাকে পেয়ে বসল।"

পিতার নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পিতা জানালেন, "না, সেখানে যাবার প্রয়োজন নাই।"

"যথা সময়ে পিতার গাড়ী শাহবাগের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যেতেই আমার সে কি কান্না। আমি যেন নিজেকে আর সামলাতেই পারি না।"

প্রায় এ ভাবেই ক্রমান্বয়ে দু'দিন অতিবাহিত হবার পর পিতা কন্যাকে বললেন, "খুকুনি, আজ তুইও যাবি। সাধু মা তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

দিদি বলেছিলেন, "আমার বাবার কথা শুনে যে কি আনন্দ! মনে হয়েছিল, মা সত্যই অন্তর্যামী।"

সেদিন সময় যেন আর কাটে না। দ্বিপ্রহরে ভোজনান্তে দিদি চললেন মায়ের দর্শনে। প্রথম দর্শন। প্রথম দর্শনেই মা দিদিকে বললেন, "এতদিন কোথায় ছিলে?" দিদি বলে চলেছেন, "মায়ের কথা শুনে জানি না কেন, আমার দু চোখ ফেটে জল বেরুতে লাগল।"...... তখন ১৯২৬ এর জানুয়ারী মাস।

শুরু হল নিয়মিত যাওয়া আসা। কিছুদিন অতিবাহিত

হবার পর একদিন মা দিদিকে বলেছিলেন, "এখন এই শরীর দিয়ে সব কাজ কর্ম আর ঠিকমত হয় না। তাই সাহায্য করার জন্য ভগা তোকে পাঠিয়েছে।"

একদিন শশাঙ্ক বাবুর ইচ্ছা আপন গৃহে মায়ের ভোগ দেন। সব ব্যবস্থার পর মা ভোগে বসেছেন। দিদি পাশেই উপবিষ্ট। ভোগ গ্রহণ করতে করতে মা হঠাৎ দিদির মুখে অন্ন তুলে দিতে লাগলেন। এ ব্যাপারে দিদিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, "না, আমার সেদিন এতে লজ্জা সংকোচের কোন ভাবই আসে নি। যেন কত আপনজন। কত স্বাভাবিক ব্যাপার। মা একবার অন্ন গ্রহণ করেন তো আমার মুখে দু'বার তুলে দেন। আমি মাকে বলেছিলাম, মা, তুমি তো আমাকেই খাওয়াচ্ছ, তুমি খাও।" ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মায়ের উত্তর ছিল, "আজ তোমাকে খাইয়ে দিলাম, পরে তো তুমি আমাকে খাওয়াবে।"

আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি — পরে মায়ের যাবতীয় সেবাকার্যের ভার দিদির উপরেই ন্যস্ত ছিল। যাক্।

এর পর হতে মা ও দিদির দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ঘটনা আমাদের সকলেরই জ্ঞাত। সুতরাং সে ঘটনার দ্বিরুক্তি না করে এবার দিদিকে দেখা যাক। কারণ সমাজ, পরিবার এমন কি ব্যক্তিগত জীবনেও আমাদের এরূপ বহু জিজ্ঞাসা আসে, যার উত্তর আমাদের মেলে দিদির জীবনে।

'স্বে মহিম্নি'

দিদির ছিল শিশুসুলভ বৃত্তি। জাগতিক রীতি-নীতির ব্যাপারে তিনি ততটা মস্তিষ্ক সঞ্চালন করতেন না। বিশেষ করে আপন জনের ব্যাপারে। তিনি বলতেন, মা তো নিত্য ভাগবতী স্থিতিতেই স্থিত। তিনি ভাবগ্রাহী। তিনি জনার্দ্দন।

একবার মা দিদিকে তাঁর বস্ত্রখানি পরিধান করিয়ে দিতে বললেন। দিদি উল্টো ভাবে বস্ত্রখানা পরিধান করিয়ে দিলেন। শশাঙ্ক বাবু তা লক্ষ্য করে বললেন, "মা, মেয়ের কাণ্ড দেখলে তো! ও না পারে খেতে খাওয়াতে, না পারে কাপড়খানা পরতে পরাতে। অথচ তুমি ওকে দিয়েই সব করাবে।"

সঙ্গে সঙ্গেই মা পরিহিত বস্ত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'তাইত। থাক, ও যখন উল্টো করে পরিয়েছে, তখন আজ এ ভাবেই কাপড় পরে থাকব। এ শরীরটার এই-ই খেয়াল। যে নিজেরটা জানে না, তাকে দিয়েই সব করায়, তার নিকট হতেই সব নেয়।"

এই শিশুবৃত্তির কারণে যে গুণটি তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হত, তা হল অল্পে সন্তুষ্টি।

একবার নবরাত্রির দিনগুলিতে দিদি মায়ের গলায় নিত্য একটি করে মালা গেঁথে পরিয়ে দিতেন। মালার ফুলগুলি কখনো উল্টো, কখনো সোজা হয়ে যেত। শশাঙ্ক বাবু সে

দিকে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একদা বলেছিলেন, "তোমার গলার মালাটার ফুলগুলি কিছু উল্টা কিছু সোজা। ওটা নিশ্চয়ই খুকুনীর গাঁথা। মা, যে মালাটা গাঁথতেও জানে না, তুমি তাকে বল পূজো করতে।"

মার উত্তর, "দেখ, ও যে ভাবে পূজো করে, তাতেই ভগবানের পূজা হয়।"

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মা তারাপীঠে। স্থির হল দিদির উপনয়ন হবে। সে সংবাদ প্রচারিত হতেই ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত হতে লাগল বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে। মায়ের খেয়াল, তবুও স্ত্রী উপনয়নের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে লাগল। স্পষ্টত:ই তার কারণ অবহুজ্ঞতা এবং অদূরদর্শিতা। ব্যাপারটী কাশীধামের বিদগ্ধ শাস্ত্র-পণ্ডিতগণের নিকট প্রেরিত হল, তাঁরা নি:সংশয়ে পুরাকালের দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধার সহ তার বিধান দিলেন। দিদির উপনয়ন হয়ে গেল। আচার্য্য গুরু হলেন শ্রী দীনেশ চন্দ্র শাস্ত্রী। দিদি বলেছিলেন, "সর্বজ্ঞা মা, তাঁর কি ভ্রান্তি হতে পারে!"

উপনয়ন উপলক্ষে দিদি ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করলেন, সবাই দিদির সে বেশ দেখে বলত, ব্রহ্মচারী দাদা।

'ব্রহ্মচারী দাদা' সে অবধি বেশে বাসে, চাল-চলনে, কথা-বার্ত্তায় দাদা-ই হয়ে উঠলেন। মা তো পূর্বেই গত

হয়েছেন, পরে পিতাকে যখন ত্যাগ করতে হয়েছিল, তাঁর সেই ভাব দেখে মাও বলেছিলেন, "দিদি সারা জীবন তো এই ভাবেই চলতে হবে। তখন আর বন্ধন কিসের? আর বন্ধন না রেখে পুরুষের মত ক্রিয়া ও ভাবের গতিতে চল। পৈতা হয়ে গেছে, কপালে ভস্ম রাখবে, শিখা বাঁধবে....." ইত্যাদি।

মায়ের নিকট হতে ছাড়পত্র পেয়ে দিদি ভাই হয়ে গেলেন। একবার এ ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা ঘটে ছিল। দিদি গুটি কয়েক কুমারী কন্যাকে নিয়ে চলেছেন। মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত কামড়ায় দিদি সদল বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে কামড়ার মেয়েরা হৈ হৈ করে উঠলেন — "নামুন, নামুন, এটা মেয়েদের কামড়া।"

দৃঢ়তার সঙ্গে দিদি বললেন — 'জানিই তো। তাইত এ কামড়ায় উঠেছি।'

কামড়ার মহিলাগণ একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ।

মায়ের গলার স্বর্ণ হারটি মা নিজ হাতেই দিদির কণ্ঠে ধারণ করিয়ে বলেছিলেন, "দিদির পৈতা হল।"

দিদি ছিলেন সকলেরই পরম আদরের। এ কারণেই তাঁকে আদর করে নানান জন, নানান নামে সম্বোধন করত।

জন্মাবধিই তিনি আদরের আদরিণী। আদরের নাম খুকুনীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া।

১৩৪০ এর কথা। পৌষ সংক্রান্তির দিনে কাশীতে দিদি এবং মৌনী মা এক সঙ্গেই উপস্থিত হয়েছিলেন মাকে প্রণাম করতে। মা তাদের উভয়কেই আশীর্ব্বাদ সহ পীত বস্ত্র দেন এবং দিদিকে বলেন, "দিদি তোমার নাম হল গুরুপ্রিয়ানন্দ।" তিনি যে গুরুরও প্রিয়, পরম আদরের, তারও প্রমাণ মিলল। আর 'দিদি' নাম?

মা বললেন, "দিদিমা, দাদামশায়, মাখন এদের এ শরীরের দিদিকে আদর যত্ন করে 'দিদি' ডাকার দিকটা। এ শরীরটাও 'দিদি' বলেই ডাকতে সুরু করেছে।"

অদূরে দণ্ডায়মান দিদি। তিনি বললেন, "কি? তোমার শরীরের যে বড় বোন মারা গেছে, আমিই বুঝি সেই?"

মা (মৃদু হেসে), "তুই বল্লি কিন্তু।"

সে সময়টাতেই বেলুদি সেখানে গিয়ে উপস্থিত। তাকে দেখেই মা বললেন, "দেখ, দিদি কি বলছে। আমি-ই তোমার সেই বড় বোন নাকি?" বলেই মার কী উচ্ছ্বাসিত হাসি। সে হাসির মধ্য দিয়েই ফুটে উঠল দিদির পূর্বজন্মের পরিচয়।

'দাদাভাই' নামেও দিদির পরিচয় পেয়েছি কন্যাপীঠের ছাত্র ব্রহ্মচারিণীদের নিকটে। ওদের নিকটে দিদি প্রকৃত দাদাভাই ছিলেন। দাদা রূপে তিনি ওদের শিক্ষা-দীক্ষা আচার ব্যবহার, কথা-বার্ত্তায়, এক কথায় প্রকৃত নারীর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে যেমন ছিল সদা-সর্বদা তাঁর সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তেমনি ভাইরূপে ওদের জীবনটাকে তিনি আদরে যত্নে, সুখে আনন্দে, প্রীতি ভালবাসায় ভরিয়ে তুলতেন।

আবার কখনো কখনো দিদিকে কেউ কেউ বলত, 'মায়ের নন্দী'।

মায়ের প্রথম দর্শন থেকেই দিদি ছিলেন মাতৃ-ক্রোড়ে আত্ম-নিবেদিতা। শিশু যেমন মায়ের নিকটে সর্ব-সমর্পিত অবস্থায় থাকে, বিচার, বিতর্ক, যুক্তি, তর্কের সে স্থানে কোন প্রশ্নই ওঠে না। দিদির ভাবও ছিল ঠিক তেমন-ই।

একবার দিদি মাকে বলেছিলেন, "মা, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি যদি সব ভুলে যেতে পারতাম।" মা হেসে বলেছিলেন, "এ শরীরটাকে ও.......।"

প্রকৃত পক্ষে দিদির বোধ হয় বক্তব্য ছিল, জাগতিক যাবতীয় ব্যাপার-ই তাঁর নিকট তুচ্ছ, অর্থহীন বলে প্রতীত হত। মা ভিন্ন জগতে যে কিছুই নাই, এ বোধটাই সে সময়ে তাঁর নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হত। তিনি বোধহয়

অনুভব করতেন, মা বিরাট, মা বিশ্বজোড়া। আসলে সে সব মুহূর্ত্তে তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীশ্রী মায়ের স্বরূপ কী ভাবে পরিস্ফুট হত তা সাধারণের পক্ষে ধারণা করাও কেবল মাত্র দু:সাধ্যই ছিল না। তা ছিল অসম্ভবও।

একবার দিদি এই লেখককেই বলেছিলেন, "আমরা কি নিয়ে খেলছি, কেউ তা জানে না। আমরা যে আগুন নিয়ে খেলছি। বুঝলি, এ এমন আগুন, যার স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ মাত্রেই জীবন ধন্য হয়ে যায়।" আরো বলেছিলেন, "সাধন ভজন আবার কী। সাধন ভজন মায়ের সেবা। তাঁর সেবাতে অসম্ভবও সম্ভব হয় রে।"

দিদির জীবন যে কত বিচিত্রতায় ভরা তা যাঁরা দিদির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁরাই জানেন। অন্যথায় তা ধরা অসম্ভব ছিল।

একবার মা কতিপয় দিবসের জন্য দিদিকে বৃন্দাবনে রেখে গেছেন। যাবার প্রাক্কালে মা বলে গেলেন, "দিদি রইল, দিদিকে দেখো।" সুযোগ সুবিধা মত দিদির নিকট আসা যাওয়া হত। গেলে দিদি কখনো পত্রাদির উত্তর লেখাতেন, কিংবা তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ের কথা বলতেন। সে সময় দিদির জীবনের অজস্র বিচিত্র ঘটনাও শোনা যেতো।

'স্বে মহিম্নি'

একদিন দিদি একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, চিঠিখানা শোনা তো।

শোনান হল। লিখেছেন, দিদি আপনার আশীর্ব্বাদ চাইছি, আপনার আশীর্ব্বাদে কাজ সম্পূর্ণ করে এক লাফে সাগর পেরিয়ে আসতে পারব ইত্যাদি।

দিদি বললেন, উনি কি হনুমান নাকি? হনুমান-ই তো এক লাফে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন না?

দিদির কথায় সীতা উদ্ধারের ঘটনা মনে পড়তে বললাম, হনুমান না। তার বক্তব্য হ'ল আপনার আশীর্ব্বাদ শ্রীরাম চন্দ্রের আশীর্ব্বাদের মতই ফলপ্রদ এ কথাই তার লেখার উদ্দেশ্য।

দিদির উত্তর — "হ, হ, রাখ্ তো।"

অনেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে দিদির পরামর্শের জন্য উপস্থিত হতেন। সে ক্ষেত্রে দেখতাম, সর্বদাই দিদি বলতেন, "এ সব সিদ্ধান্ত কি তোমার আমার দ্বারা হয়। যাঁর দ্বারা হয় তিনি ঐ ঘরে আছেন। তাঁর কাছে যাও।" বলে মায়ের দরবারে পাঠিয়ে দিতেন।

এ সব ঘটনা তাদের দিদির প্রতি গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসেরই তো দ্যোতক!

আর একবার কার্য্যোপলক্ষ্যে দিদিকে ইটাওয়া যেতে হয়েছিল। সঙ্গে দু'জন আমরাও। কার্য শেষে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় স্টেশনে এসেছেন জনা কয়েক ব্যক্তি। যথা সময়ে গাড়ী অগ্রসর হয়ে চলল। কিয়দ্দূর যাবার পরেও স্টেশনের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল যতদূর তাঁদের দৃষ্টি সীমা, তাঁরা করজোরে উর্দ্ধবাহু হয়ে দৃষ্টি মেলে আছেন, দিদির কম্পার্টমেন্টের দিকে।

এ জাতীয় দৃশ্য শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে যাতায়াতের সময়ে সর্বদাই দেখা যেতো। কিন্তু দিদির প্রতিও ভক্তজনের কত শ্রদ্ধা ভক্তি। এ সব তো তারই নিদর্শন।

আরো একবার, বৃন্দাবনেই দিদি এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, কিছু ঝাল কাঁচা লঙ্কা এনে দিতে পার?

দীর্ঘ সময় পরে লোকটি কাঁচা লঙ্কা সহ এসে উপস্থিত। তার চোখ, মুখ রক্তবর্ণ, দুচোখেই জল।

দিদি বললেন— এত দেরী যে! আরে, চোখে, মুখে এ কী হয়েছে?

লোকটির উত্তর— "দিদি ঘুরে ঘুরেও ঝাল কাঁচা লঙ্কা আর পাই না। ঝাল কিনা দেখতে গিয়ে অনেক কাঁচা লঙ্কা চাখতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক দোকানে পাওয়া গেল।

লোকটি চলে গেলে দিদি বললেন— "লোক যে কত বোকা হতে পারে, দেখলি!"

হ্যা দেখেছিলাম, কিন্তু দেখেছিলাম বোকা নয়— দিদির আদেশ পালনে লোকটির কত ভক্তি নিষ্ঠা।

অন্য একদিন আর এক চিঠির কথা। এক ভদ্র মহিলা লিখেছেন— "দিদি, আপনার জীবন সেবার আলোতে ঝলমলে, আর অভিজ্ঞতায় ভরা। খুব জানতে ইচ্ছা করে মায়ের সেবার অভিজ্ঞতার কথা। আপনি তা আনন্দবার্ত্তায় লিখুন না। তাতে বহু লোক উপকৃত হবে সেবার আদর্শ ও উপকারিতা জেনে।"

স্পষ্টত:ই ভদ্র মহিলা বেশ শিক্ষিতা এবং শ্রদ্ধা সম্পন্না। চিঠি শ্রবণান্তর দিদি—"এই দেখ, কেমন আদিখ্যেতার কথা, খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! যা হয় লিখে দে।"

আমি— "সে কি, কত শ্রদ্ধা আগ্রহ ভরে তিনি চিঠি খানা লিখেছেন। আর সত্যিই তো আপনার জীবনে মায়ের সেবার অভিজ্ঞতা, সে তো জানবার মতই। আপনি বলুন আমি লিখে দিচ্ছি।"

দিদির সংক্ষিপ্ত উত্তর— "আমার জীবনের অভিজ্ঞতা মায়ের প্রতি এক অকল্পনীয় আকর্ষণ আর মায়ের

অফুরন্ত অসীম কৃপা!"

আরো একদিন। সেও এক ভারী মজার ঘটনা। দিদি মাতৃ মন্দিরের উন্মুক্ত বারান্দায় বসে পত্রের উত্তর লেখাচ্ছেন। সে সময় এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। এসেই বললেন, "গুরুপ্রিয়া দিদির সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিশেষ প্রয়োজন।" স্পষ্টত:ই তাঁর নিকট দিদি অপরিচিতা। দিদি পত্র পড়তে ব্যস্ত থাকায় সংক্ষেপে বললেন, "বসুন।"

অল্পক্ষণ পরেই তিনি পুনরায় বললেন, "কই দিদিকে খবরটা....." সঙ্গে সঙ্গেই দিদি বললেন, 'হ্যা বলছি।' ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে বললেন, "কথাটা জরুরি.....

সে কথা বলতেই দিদি বললেন, "বলুন, কি কথা।"

ভদ্রলোক — "দিদিকেই বলব। খবরটা—" সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলেছিলাম, "ইনিই দিদি"।

ভদ্রলোক যেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হলেন, "এ্যা ইনিই!" সঙ্গে সঙ্গেই দিদির চরণের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে বললেন, "দিদি, আপনিই! আমি চিনতে পারি নি, আমাকে ক্ষমা করবেন দিদি।"

এরূপ অরো অজস্র ঘটনা দিদির জীবনে আছে, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর স্ফীতির কারণে তার উল্লেখ থেকে

নিরস্ত হতে হল।

সঙ্গীত শাস্ত্রে দিদির বুৎপত্তি বিশেষ না থাকলেও বিশিষ্ট কোন গানের রসাস্বাদনে দিদিকে তন্ময় হতে দেখা যেতো। রামপ্রসাদী সঙ্গীত দিদির পরম প্রিয় ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানে ভাব বিহ্বল হয়ে যেতেন। দিদির কণ্ঠে রাম প্রসাদের 'তোমার ধনে ধন্য হয়ে যায়' এই গান এবং 'আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি' এই গানটি বেশ কয়েকবারই শুনেছি এবং রবীন্দ্রনাথের 'শুধু তোমার বাণী নয় হে বন্ধু' এবং 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' গান গুণগুণ স্বরে গাইতে গাইতে তাঁকে ভাব বিহ্বল হতেও দেখেছি। যদিও মায়ের সঙ্গে থাকাকালে তাঁর সঙ্গীত করার সময় হত না, কিন্তু মা যখন দিদিকে রেখে অন্যত্র যেতেন, তখন কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে গুণ গুণ স্বরে চলত দিদির সঙ্গীত চর্চ্চা।

দিদি আজীবন শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তগোষ্ঠির প্রধান হয়ে যে রয়ে গেলেন, তার প্রধান কারণ মনে হয় মায়ের কৃপা। অন্যথায় দিদির ন্যায় এত সহজ সরল লোকের পক্ষে তা নি:সন্দেহে অসম্ভব হত। দিদি যে মায়ের পরম প্রিয় ছিলেন, মায়ের দেওয়া গুরুপ্রিয়া নাম তার সাক্ষ্য বহন করে। গুরুকে প্রকৃত গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠা করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। যেভাবে গুরুকে মন প্রাণ সমর্পণ করতে পারলে প্রকৃত শিষ্যত্ব লাভ হয়, দিদি তা পেরেছিলেন এবং একারণেই

তিনি ছিলেন গুরুপ্রিয়া।

শাস্ত্র বলে, গুরু বাক্য অভ্রান্ত। তা নির্বিচারে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে হয়। গুরু মুখ নিঃসৃত সবই অভ্রান্ত রূপে গ্রহণীয়।

স্মরণে আছে একদা মা দিদিকে বলেছিলেন—'দিদি আজ শুক্রবারই তো?' শ্রবণ মাত্র দিদির উত্তর, 'হ মা'। পরক্ষণেই মা পুনরায় বললেন, 'না দিদি, আজ বৃহস্পতিবার।' দিদির সেই তাৎক্ষণিক উত্তর, 'হ মা'।

ঘটনাটি অতি তুচ্ছ। কিন্তু লক্ষণীয়। মায়ের শ্রীমুখ হতে যা উচ্চারিত হয় তার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি কিংবা বিচার, ভাবনার কোন প্রশ্নই হতে পারে না—এই যে চরম ও পরম বিশ্বাস, তা সম্ভব তখনি যখন গুরুকে প্রকৃত গুরু রূপে গ্রহণ করা যায়। এই কারণেই বলতে পারা যায় তিনি ছিলেন প্রকৃত শিষ্য, গুরুর আসনে তিনি গুরুকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঢাকাতেও একবার মায়ের কী খেয়াল হল তিনি উপস্থিত সকলের চরণ ধূলি গ্রহণের জন্য সকলের নিকট উপস্থিত হতে লাগলেন।

মা অন্যের চরণ ধূলি গ্রহণ করবেন তাও কি সম্ভব! সুতরাং সকলেরই এক বাক্য, না না, হয় না। পর দিবস

সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে, দিদি মাকে বললেন, না মা। তুমি তো আমার কাছে আস নাই? এলে আমি কখনই মানা করতাম না।

আসলে এ হল একটা স্থিতি। এ স্থিতিতে ভেদাভেদ বিদূরিত হয়ে যায়। দিদি হয়ে গিয়েছিলেন মা-ময়। বিন্ধ্যাচলে একবার মা আছেন। রমা দেবী নামীয় এক মহিলা মায়ের সেবায়। রমাদিকে বলা হয়েছিল মায়ের রাত্রি বাসের পরিহিত বস্ত্র প্রক্ষালন করতে। রমাদি ভ্রান্তি বশতঃ মায়ের বস্ত্রের পরিবর্ত্তে দিদির বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করেন। এ প্রসঙ্গে মা বলেছিলেন, "তাতে কি! যেই দিদি সেই মা, যেই মা সেই দিদি। বিভেদ তো তোমাদের দৃষ্টিতে।"

মায়ের এ উক্তি থেকে আর যাই সিদ্ধান্ত করা যাক না কেন, দিদি যে মহিমময়ী মহিলা, সে বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

জগৎ কল্যাণেও দিদির অবদান বড় কম নয়। শ্রীশ্রী মায়ের নামাঙ্কিত কন্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠ, হাসপাতাল এবং মায়ের আশ্রমগুলির উদ্যোক্তা এবং রূপদাত্রী ছিলেন দিদিই। তাদের সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছেন তিনিই, ঠিক সে ভাবে যে ভাবে জ্ঞান বুদ্ধিহীন শিশুকে তার জননী হাত ধরে চলতে শেখান। আমরা দেখেছি তিনি তাঁর পরিচালনার আদর্শকে কী ভাবে স্বীয় জীবনে দেখিয়েছেন। তিনি

দেখিয়েছেন, কী ভাবে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যেও আপন লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তিনি দেখিয়েছেন আদর্শের পথে ত্যাগ বৈরাগ্য, মায়ের প্রতি নির্ভরতা, নিষ্ঠা, নি:স্পৃহতা থাকলে কী ভাবে জীবনের লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। তিনি ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞান, উচ্চ-নীচ বর্ণের সকলকে নির্বিশেষে তাঁর প্রতিষ্ঠান গুলিতে সাদরে গ্রহণ করে দেখিয়েছেন লোক কল্যাণের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। সুতরাং আজ আনন্দময়ী সংঘের এই যে সর্বজনীন রূপ নি:সন্দেহ তা দিদিরই অবদান।

এভাবে প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে, প্রকাশ্যে, গুপ্তভাবে, তিনি যে জগৎকে কত ভাবে কত কিছু দান করে গেছেন, সে সব অবতারণার সুযোগ স্ফীতির কারণে আর এ প্রবন্ধে নাই। সংক্ষেপে বলতে পারা যায় দিদি স্ব-মহিমায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং স্ব-মহিমাতেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন নিজেকে।

শেষ জীবনে কিছু কাল তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। তখনো দেখেছি তাঁর নিকটে কেহ উপস্থিত হলে, সে অবস্থাতেও তাঁর নিকট মাতৃবিষয়ক কথা, মায়ের গতি বিধির বিষয়ে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করতেন। লক্ষ্য করেছি সে সময় তাঁর মুখাবয়বে একটা শান্তি ও আনন্দের আভা ফুটে উঠত।

'স্বে মহিম্নি'

দিদি যখন অসুস্থ অবস্থায় মায়ের কাশী আশ্রমে, তখন মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে ভাগবত-পারায়ণ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সে উপলক্ষে মাও তখন বৃন্দাবনেই।

সেদিন ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপাখ্যান বর্ণিত হচ্ছিল। মাও ভাগবতের আসরেই উপস্থিত। অকস্মাৎ মা বলে উঠলেন, "দিদি চলে গেল।"

কিছু সময় পরেই কাশীর টেলিগ্রাম: দিদি চলে গেছেন।

সংবাদ পেয়েই ভাগবতে উপস্থিত জনতা বলে উঠেছিল — "মা, দিদি চলে গেলেন?"

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল ভাগবতের আসর।

সেই দিনই মা চলে গেলেন কাশীতে।

পর দিবস কাশী আশ্রমের চণ্ডী মণ্ডপের সম্মুখে দিদির পার্থিব শরীরকে পুষ্প, মাল্য, চন্দনে সজ্জিত করে কুশাসনের ওপরে আসন বদ্ধ করে উপবেশন করান হল। নাম চলল। অনুষ্ঠিত হল দিদির শেষ পূজা, শেষ আরতি আর অন্তিম প্রণাম। ব্যোম ব্যোম্ হর হর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল আশ্রম প্রাঙ্গন। দিদির ভালে তখন ভস্ম-ত্রিপুণ্ডক, অঙ্গে গেরুয়া বসন, মস্তকে শিরত্রাণ উষ্ণীষের আকারে বাঁধা।

দিদির গঙ্গাযাত্রা সুরু হল সাধু ব্রহ্মচারীর স্কন্ধে।

মা আছেন আশ্রমস্থ আপন কক্ষেই।

মণিকর্ণিকা ঘাটে বিষ্ণুপাদপদ্মের সমীপে অগণিত জনতার সম্মুখে সলিল সমাধিতে চির অন্তর্হিত হয়ে গেলেন দিদি। ঠিক সেই ক্ষণেই আশ্রম কক্ষে শায়িতা মা বলে উঠলেন, "হয়ে গেল প্রতিমা বিসর্জন।"

গঙ্গা তটে দাঁড়িয়ে দেখা গেল অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, অনাথের বন্ধু এক মহিমান্বিত জীবনের পরিসমাপ্তি। প্রবহমান জাহ্নবীর প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হল একটি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পুণ্যময় দেবদেহ। হারিয়ে গেলেন আমাদের স্নেহময়ী আদরিনী, খুকুনি, দাদাভাই। চলে গেলেন মায়ের গুরুপ্রিয়া।

সেদিন দেখা গিয়েছিল তিনি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। কিন্তু আজ দেখি, তিনি অন্তর্হিত হন নি। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে মায়ের সকল আশ্রমে, মায়ের কন্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠে, মায়ের হাসপাতালে, করুণায় শত স্মৃতিতে বিরাজিত।

স্মৃতি-পূজা

[১২ই ফেব্রুয়ারী, মাঘী সংক্রান্তি, ১৯৮২, শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে শ্রীগুরুপ্রিয়া দিদির জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির আসন হইতে শ্রী রণধীর দস্তিদারের ভাষণের প্রতিলিপি]

বিধাতা করুন এদিন আবার
ফিরিয়া আসুক বহু বহু বার।

এই প্রার্থনা বহুবার আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। সেদিন আজ ফিরে এসেছে, কিন্তু যাঁকে উদ্দেশ্য করে আমরা এই প্রার্থনা জানিয়ে ছিলাম তিনি আজ আমাদের মধ্যে সশরীরে বর্তমান নেই। তবুও জন্মদিন এসেছে— ফিরে ফিরে আসে, বার বার আসে। জন্মদিন আসে আমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য যে 'এ জীবন নিত্যই নূতন আলোকিত পুলকিত দিনের মতন।' জীবন ত ফুরিয়ে যায়, তবুও এই জীবনের একটা নিত্যতা আছে, চিরন্তনতা আছে, বহমানতা আছে। সেটা কিসের মধ্যে? সেটা তার কীর্তির মধ্যে, তাঁর আদর্শের মধ্যে। দিদি আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছেন, তবুও আমরা বলি, 'তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের।' এই চিরকালের দিদি যিনি, তাঁরই স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

দিদির সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার ক্ষমতা আমার নেই। তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ আমার হয়নি। প্রথম প্রথম কিছুটা আড়াল থেকে তাঁকে দেখেছি। তিনি যখন শেষ বয়সে মাঝে মাঝে কন্যাপীঠে এসে বাস করতেন তখন তাঁকে কিছুটা কাছে থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যদিও তাঁকে দেখেছি অল্প, তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি অনেক। সেই দেখা ও শোনায় মিলিয়ে যে ছবিটা আমার মনে ফুটে উঠেছে তারই একটি অস্পষ্ট রূপরেখা আপনাদের কাছে আজ নিবেদন করতে চেষ্টা করব। এই ভরসায় চেষ্টা করব যে আপনারা নিজেদের কল্পনা দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ছবিটাকে স্পষ্ট ও পূর্ণতর করে তুলবেন।

দিদিকে শেষ বয়সে যখন কন্যাপীঠে মাঝে মাঝে দেখেছি তখন মধ্যাহ্নের খরদীপ্তি ম্লান হয়ে এসেছে, দিদির চোখে মুখে নেমেছে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ লাবণ্য। রোজ সকালবেলা কন্যাপীঠে আসার সময় দেখতাম দিদি বসে আছেন কন্যাপীঠের বারান্দায়, অন্নপূর্ণা মন্দিরের দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে। তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, 'দিদি, কেমন আছেন ?' সলজ্জ মৃদু হেসে, নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত জোড় করে বলতেন, 'ভাল আছি।' তাঁর সেই বিনম্র সৌজন্য আমাকে অভিভূত করত। ছবিটা এখনো আমার চোখে স্পষ্ট ভাসছে। মা যখন কাশীতে আসতেন তখন দিদিকে দেখতাম মা'র

পদপ্রান্তে আসীন। মা'র অনুপস্থিতিতে যখন রোজ সকালে তাঁকে কন্যাপীঠের বারান্দায় দেখতাম, তখন কেমন যেন মনে হত তাঁর মাতৃবিরহবিধুর অন্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। বড় করুণ সেই ছবি।

দিদির বিচিত্র-বর্ণবহুল জীবনের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে যেটা আমার মনে হয়, আমি আরেক বারও বলেছি, এবারও না বলে থাকতে পারছি না, সেটা হল দিদির বিদ্রোহিনী রূপ। দিদির জীবনকে আমি চার ভাগে ভাগ করব — বিদ্রোহিনী, সেবিকা, কর্মযোগিনী ও সাধিকা এই চারটা রূপে আজকে আমি দিদিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

দিদির এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন সে কথা। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেকালে এইটেই ছিল রীতি। এইটেই ছিল প্রথা। বিস্ময় আসছে তারপরে। সেই এগারো বছরের কিশোরী, কিশোরীও বলব না — বালিকাই বলব আমি, এগারো বছরের বালিকা যেমন অন্য নববধূরা বাসর ঘরে যায় অন্যদের নির্দেশ মত, একটি লজ্জাবনত লতার মত বাসর ঘরে ঢোকে, দিদি তা করলেন না। তিনি বাসর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন —

"যাবনা বাসর কক্ষে, বধূ বেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী,
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।"

তিনি বধূবেশে কিঙ্কিনী বাজিয়ে বাসর ঘরে যেতে অস্বীকার

করলেন। তিনি বললেন, "আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।" আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রত্যেকটি কথা— প্রেমের বীর্য— প্রেমের মাধুর্য্য নয়, প্রেমের লালিত্য নয়, প্রেমের কোমলতা নয়। প্রেমের বীর্য, প্রেমের কাঠিন্য, প্রেমের কঠোরতা—সেইটাই তিনি চাইলেন বিধাতার কাছে। তাঁর জীবনে 'প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী' কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। যে প্রেম ঘুম পাড়ানিয়া সুরে গান গায় সে প্রেম তিনি চাননি। ঘুম ভাঙনিয়া সুরে যে প্রেম গান গায়, যে প্রেম দু:খ জাগনিয়া, যে প্রেম বৃহত্তম জীবনে উন্নীত করে, সেই প্রেমের প্রার্থনা তিনি করেছিলেন। "আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী" আপনারা জানেন কতখানি নি:শঙ্কচিত্ত ছিলেন তিনি। এই কবিতার প্রত্যেকটি লাইনই যেন মনে হয় দিদিকে উপলক্ষ্য করে লেখা।

দিদি রয়ে গেলেন পিতৃগৃহে। প্রথামত স্বামীগৃহে বাস করলেন না। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে সেখানে নেওয়া গেল না। প্রলোভন বা পীড়ন কিছুই তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারল না। এটা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, এটা ছিল আজন্ম ব্রহ্মচারিণীর দেহ মনের শুচিতা রক্ষার স্বত:স্ফূর্ত প্রয়াস। পিতৃগৃহে পিতামাতার সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। সবরকম বিলাসিতা বর্জন করলেন। ধনীগৃহের কন্যা ছিলেন তিনি। কিন্তু বিলাসিতায় তাঁর রুচি ছিল না। কোনোরকম বিলাসিতাই তিনি পছন্দ করতেন না এবং চেষ্টা করেও

তাঁকে কেউ বিলাসিতার মধ্যে নিতে পারে নি।

পিতামাতার সেবায় তিনি দিনযাপন করতে লাগলেন। অধ্যয়ন করতে লাগলেন, নিজের বাড়িতে বসে অনেক বই পড়লেন। শুনেছি সেকালের বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ অনেক গ্রন্থই তাঁর অধিগত ছিল। কিন্তু একটা কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, দিদি অবসর সময়ে কি করতেন। তাঁর মন কি কখনো বলতো না, "তোরা শুনিস নে কি! শুনিস নে কি? তাঁর পায়ের ধ্বনি! সে যে আসে আসে, আসে যুগে যুগে পলে পলে দিনে রজনীতে।"

মা'র কথা তিনি জানতেন না—তখনো দৃষ্টিগোচর হননি মা। আমার কিন্তু মনে হয় তাঁর অবচেতন মন হয়ত কোনো এক অজানার জন্য প্রতীক্ষা করত। একদিন সেই প্রতীক্ষার শেষ হল। এল সেই পরম শুভলগ্ন—অনেক বছর পরে। পিতা শশাঙ্ক মোহনের সঙ্গে তিনি গেলেন মাতৃদর্শনে। দিদির বয়স তখন বোধহয় সাতাশ কি আঠাশ বছর। সেই প্রথম দর্শনেই প্রেম। দিদিকে দেখে মা বললেন, "তুমি এসেছ? কোথায় ছিলে এতদিন?" দিদি কি বললেন? আমার মনে হয় দিদি বললেন—

"তোমার আনন্দ ওই
এল দ্বারে এল এল গো,
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে
আঙিনাতে মেল গো।"

শুধু বুকের আঁচলখানি নয়, আকুল হৃদয়খানি ছড়িয়ে দিলেন তিনি ধূলার পরে। তাতে সেচন করলেন গন্ধবারি। ভক্তির গন্ধ বারি। যাতে মলিন না হয় চরণ তারি। সেই ভক্তিবারি সিক্ত ধূলার উপর দিদির হৃদয়, তার উপর দিয়ে মায়ের পদচারণ শুরু হল। দিদির জন্মান্তর ঘটল, দিদি দ্বিজত্ব লাভ করলেন। পিতৃগৃহের আদরিণী মাতৃগৃহে হলেন গুরুপ্রিয়া। দিদি নিজেকে সমর্পণ করলেন মায়ের চরণে।

"অনাস্বাদের মধু যেন যূথী অনাঘ্রাতা"

যে প্রেম ক্ষুদ্র গৃহকোণে আবদ্ধ থাকত, সেই প্রেম ভক্তিতে বিগলিত হয়ে মার চরণ ধৌত করে দিল, সেই প্রেম স্নেহে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের জীবন অভিষিক্ত করল। আমরা আমাদের দিদিকে পেলাম।

দিদি হলেন মায়ের প্রথমা সেবিকা। প্রথমা নন শুধু, প্রধানা সেবিকা। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেবিকা। সেই থেকে সারাজীবন তিনি সেবিকার ভূমিকা পালন করে এসেছেন কায়মনোবাক্যে। সেই সেবার তুলনা নেই। কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে সেই সেবা। ছায়ার মত তিনি সব সময় মাকে অনুসরণ করতেন। মাকে ঘিরেই তাঁর সমস্ত জীবন আবর্তিত হত। মার সুখ সুবিধার দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন। নিজের আহার নিদ্রার দিকে লেশমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রশ্ন নেই, সংশয় নেই, দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, যা বলছেন মা,

পালন করে যাচ্ছেন দিদি। অনেক সময় কৌতুকের ব্যাপার সৃষ্টি হত তাতে দিদি গ্রাহ্য করতেন না। কেউ যদি মায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত করত দিদির রুদ্ররোষ তার উপর নির্মম নিয়তির অমোঘতার মত এসে নামত। রক্ষা ছিল না তার! দিদির রুদ্র মূর্তি হয়ত একটা মুখোশ। মাকে রক্ষা করবার জন্য একটা মুখোশ। সেই মুখোশের আড়ালে তাকালে দেখতে পাই আমরা তাঁর মুখশ্রী লাবণ্যে ভরা, কমনীয়তায় স্নিগ্ধ, স্নেহে মধুর। দিদি একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করতেন মার চারদিকে। কারো সাধ্য হত না সেই দুর্গ ভেদ করবার। স্বজনপ্রীতি কিম্বা মহাজনভীতি কোনটাই তাঁকে তাঁর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। দুর্গ অবশ্য আজকালও রচনা করা হয়, কিন্তু সেই দুর্গে ঢুকবার পথ অনেকেই জানেন। অলিগলি পেরিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়তে পারেন। দিদির সময় সেটা সম্ভব ছিল না। তার একমাত্র কারণ মার শান্তির যাতে ব্যাঘাত না হয়, মার কিসে আরাম হয়, সেদিকেই ছিল তাঁর একমাত্র দৃষ্টি। সেইজন্যই দিদিকে কঠোরতা অবলম্বন করতে হত। তিনি ছিলেন মার অতন্দ্র প্রহরী।

তারপরে দিদির কর্মযোগিনীর রূপ। আপনারা জানেন— দিদি আমাকে একাধিকবার বলেছেন— ছেলেবেলায় তিনি ভীষণ লাজুক ছিলেন, ঘরের লোকের সঙ্গেও মুখ চেয়ে কথা কইতে পারতেন না। সেই লাজুক গৃহ কন্যাকে মা রাজপথে টেনে নিয়ে এলেন। প্রকাশ্য

দিবালোকে জনতার সামনে তাঁকে দাঁড় করালেন। মার কি অপূর্ব সৃষ্টি এই দিদি। মা এই লাজুক কন্যার মধ্যে কি করে এত শক্তি সঞ্চারিত করলেন ? দুহাতে দিদি দশভুজার মত কাজ করলেন। এত কাজ করে গেছেন দিদি। তিনি কন্যাপীঠ সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাপীঠ স্থাপনা করেছেন। নানা স্থানে আশ্রমের বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের হাসপাতাল স্থাপনা করেছেন। সবখানেই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তিনি। এই এত কাজ দিদি কি করে করলেন ? এইটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। দিদি মায়ের পতাকা তুলে নিলেন। বললেন, তোমার পতাকা আমি বহন করলাম। তারপর যাত্রা শুরু হল। দুর্গম পথে যাত্রা। শুধু দুর্গম পথে নয়, দুর্দাম বেগে দুঃসহতম কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। কত কঠিন কাজ — অগণিত কাজ তিনি করলেন। অজস্র ধারায় তাঁর কর্মশক্তি দিকে দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। সেই শক্তি মাই তাঁকে দিয়েছিলেন।

আমি এখন একটুক্ষণের জন্য কন্যাপীঠে ফিরে আসছি, যে কন্যাপীঠে আজ আমরা দিদির স্মৃতির প্রতি প্রণাম জানাতে সমবেত হয়েছি। এই কন্যাপীঠ, মায়ের আশীর্ব্বাদ ধন্য কন্যাপীঠ, কন্যাদের হাসিকান্নায় তরঙ্গিত কন্যাপীঠ, কত পুষ্প ধূপ সুরভিত কন্যাপীঠ, কত পূজাপার্বণে আল্পনা অলঙ্কৃত কন্যাপীঠ, কত আতিথেয়তায় মধুর এই কন্যাপীঠ! এই কন্যাপীঠের স্বপ্ন দেখে ছিলেন ভাইজী।

সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করলেন দিদি। এর রূপকার দিদি। কন্যাপীঠ যে আজকে দিদির এই স্মৃতি পূজার আয়োজন করেছে এটা খুবই উপযুক্ত কাজই হয়েছে। এই কন্যাপীঠ শুধু একটা বিদ্যায়তন নয়। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। কন্যাপীঠ একটা জীবনের ধারা, একটা আদর্শ, সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য যার উৎস। এই কন্যাপীঠে মাধুরীর সঙ্গে মিশেছে কল্যাণ। দিদি এর সৃষ্টি করলেন, প্রেম দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, ধৈর্য দিয়ে, দিয়ে তাঁর ধ্যান। দিদি আপ্রাণ চেষ্টা করে এই কন্যাপীঠের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। অতি শৈশবে একে তিনি মাতৃস্নেহে লালন করেছেন, কৈশোরে ও যৌবনে এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এবং বহু দুর্যোগের ভিতর দিয়ে একে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়ে দিদি বিদায় নিয়েছেন। তিনি ছিলেন কন্যাপীঠের শিয়রে চিরজাগ্রত কল্যাণ কামনা।

আপনারা সকলেই জানেন, কোন উৎসব যখন হয়, আমাদের কন্যাপীঠের উৎসাহ তখন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, কল্লোলিত হয়ে ওঠে, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দিকে দিকে। তাদের গানে, কীর্তনে তখন আশ্রমে সুরের প্লাবন। পূজা মণ্ডপের আল্পনায় অলঙ্করণে তাদের শিল্প নৈপূণ্যের স্বাক্ষর। নেপথ্যে ও প্রকাশ্যে অবিরাম তাদের নি:শব্দ কর্ম তৎপরতা। এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা, এর প্রাণকেন্দ্র কন্যাপীঠ। কন্যাপীঠের প্রাণপুরুষ ছিলেন দিদি। প্রাণ পুরুষ ছাড়া অন্য

কোন শব্দ আমি ভেবে পাই না। কেন না তাঁর পৌরুষ অনেক পুরুষকেই লজ্জা দিত। কন্যাপীঠের কন্যারা তাঁকে দাদাভাই বলে ডাকত। সুপ্রযুক্ত নাম — কেন না এই নামে স্নেহের সঙ্গে পৌরুষের একটা মিশ্রণ আছে। একজন বক্তা বলেছেন কন্যাপীঠের আকাশে বাতাসে দিদির স্মৃতি। কথাটি খুবই সত্যি। আমরা যদি একটু স্তব্ধ হয়ে বসি, তবে এখনো কন্যাপীঠে যেন শুনতে পাই তাঁর কণ্ঠস্বর, শুনতে পাই তাঁর পদধ্বনি। দিদি চিরকাল বেঁচে থাকবেন কন্যাপীঠের স্মৃতিতে — এবং আশা করব, কন্যাদের জীবনে।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও কন্যাদের কাছে একটি কথা নিবেদন করব, করেছি আগেও আরেকবার। আর হয়ত বলবার সুযোগ পাব না তোমাদের কাছে। তাই কথাটি আবার বলছি আমি। তোমরা একটা বিশেষ রঙের কাপড় পর এখানে। বিশেষ ছাঁচের চুল কাট। একটু ছোট করে কাট। তাইতে হাজারো লোকের মধ্যে তোমাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়, খুবই সহজ। কিন্তু আমি ভাবি তোমরা যখন বাইরে চলে যাবে, অনেকে যাও ও বাইরে, যখন অন্যদের মত কেশবতী হবে, অন্যদের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরবে, তখন তোমাদের খুঁজে বার করবো কি করে? তখন কি তোমরা হারিয়ে যাবে ঐ জনতার মধ্যে? আমি আশা করবো তোমরা হারাবে না। তখন তোমাদের খুঁজে বার করব তোমাদের চরিত্রের শুচিতা দিয়ে, হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে,

তোমাদের সেবাপরায়ণতার, কর্মকুশলতার এবং প্রতিদিনকার এই ধূলি ধূসরিত জীবনের তুচ্ছতা, দীনতা, সংকীর্ণতা ও মলিনতার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করবার ক্ষমতা দিয়ে। তাই যদি হয়, তবেই তোমাদের দিদির স্মৃতি পূজা আজ সার্থক হবে। তোমাদের এই কন্যাপীঠে বাস এবং এই মহৎ আদর্শের পরিমণ্ডলে জীবনযাপন সার্থক হবে। তা নইলে তোমাদের সমস্ত জপ ধ্যান, তোমাদের সমস্ত নিয়ম পালন, সমস্ত ব্রত-উপবাস, আমার মতে, শোচনীয় ব্যর্থতা। আমি আশা করব, দিদির পূজা সার্থক করতে হলে, দিদি যে আদর্শ তোমাদের কাছে রেখে গেছেন, সেবার আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ, কর্মের আদর্শ—সে আদর্শ তোমরা শুধু হৃদয়ে লালন করবে না, জীবনে পালন করবে। শুধু পালন নয়, তোমরা সেটা অন্যের জীবনে সঞ্চারিত করবে। কন্যাপীঠ দিদির প্রাণের জিনিষ ছিল বলেই এ সম্বন্ধে একটু বিশদ করে বললাম।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা দিদির সাহিত্য প্রীতির কথা বলেছেন এবং তোমাদের পড়ে শুনিয়েছেন "দেবতার গ্রাস" কবিতাটি। আমি কন্যাদের মুখে অনেক শুনেছি তাঁর সাহিত্যপ্রীতির কথা। শুনেছি কতদিন দিদি অনেক রাত পর্যন্ত তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। অপূর্ব ছিল সেই আবৃত্তি। আশ্চর্য ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। শুনেছি 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতাটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

সেটা আমার কাছে মনে হয় খুবই অর্থবহ, কারণ গান্ধারীর চরিত্রে যে দৃঢ়তা, যে ঋজুতা, সত্যনিষ্ঠা, যে ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় আমরা পাই দিদির চরিত্রেও তা প্রতিফলিত হয়েছিল। এবং সেই জন্যই বোধকরি দিদির খুব প্রিয় চরিত্র ছিল গান্ধারী। গান্ধারী যখন এসে আবেদন করলেন, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, ত্যাগ কর দুর্যোধনকে। তিনি বললেন 'আমি পিতা'। গান্ধারী কি বললেন?

গান্ধারী বললেন—

'মাতা আমি নহি'?
গর্ভভারে জর্জরিতা জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে
বহি নাই তারে?
দেহবিগলিতচিত্ত শুভ্র দুগ্ধ ধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি?
তার সেই অকলঙ্ক শিশু মুখ চাহি?
....তবু কহি মহারাজ
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ কর আজ।"

চরিত্রের এই দৃঢ়তা, এই যে সত্যনিষ্ঠা, এর তুলনা কোথায়? এইটে দিদির চরিত্রের সাথে মিলে যাচ্ছে বলে আমার মনে হয় দিদির এটা খুব প্রিয় কবিতা ছিল। 'দেবতার গ্রাস' বিপরীত সুরের কবিতা, আলাদা রসের কবিতা। করুণ রসের কবিতা। সেই রাখালের মুখে 'মাসী! মাসী! মাসী!' করুণ আর্তনাদ, আমি কল্পনা করতে পারি, তা পড়তে গিয়ে দিদির

চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এই কঠোর কোমলে মিশ্রণ ছিল দিদির চরিত্রের বিশেষত্ব। সাহিত্যপ্রীতির কথা যখন উঠল তখন আর একটা কথা মনে পড়ছে। আমি কন্যাদের মুখে শুনেছি, বড় কন্যাদের মুখে, যে দিদির চরিত্রে সব বিষয়ে একটা উদারতা ছিল। তিনি সাহিত্যের রসের মহলে নি:সঙ্কোচে প্রবেশ করতেন কন্যাদের নিয়ে, যেখানে অন্যরা প্রবেশ করতে সাহস পেতেন না। তাঁর চরিত্রে প্রকৃত শুচিতা ছিল বলেই শুচিবায়ু ছিল না। আরো শুনেছি কন্যাদের মুখে, কন্যারা আব্দার করল বৃন্দাবনে পূজোর পর বিসর্জন দেখতে যাবে। দিদি বললেন, "দোষ কি ? যা তোরা।" আবার দিল্লী না কোথায় আব্দার করল, আমরা এরোড্রম দেখতে যাব। দিদি তাদের অবাধে অনুমতি দিলেন। এই যে উদারতা, এই যে সাহসিকতা, এটা দিদির চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল। তাঁর সমস্তই বিরাট ছিল। বড় মাপের মানুষ ছিলেন তিনি। মন বড়, দেহ বড়, গলা ছিল দরাজ। হৃদয়ও তেমনি উদার ছিল। দিদির চরিত্রের এই বিশেষত্বটি আমার খুব মনে লাগে। দিদি বিশ্বাস করতেন জানলা দরজা সব সময় বন্ধ রাখলে চলে না, জানলা দরজা খুলেও দিতে হয় মাঝে মাঝে। শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আলো হাওয়ার প্রয়োজন।

এবার আমি সাধিকা হিসাবে দিদির বিষয়ে দু একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। সংক্ষেপে বলব। বলবার

ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

সাধনা কাকে বলে আমি জানিনা। সর্ব সমর্পিত প্রেম যদি সাধনার লক্ষণ হয়, ইষ্টের চরণে আত্ম বিলুপ্তি যদি সাধনার লক্ষণ হয়, তবে দিদি সাধিকা। অহং-এর বিসর্জন যদি সাধনার লক্ষণ হয়, তবে দিদি সাধিকা। যদি শরণাগতি সাধনার লক্ষণ হয়, তবে দিদি সাধিকা। আপনারা জানেন দিদি যেবার খুব অসুস্থ হয়েছিলেন, বহু বছর পূর্বে দীর্ঘকাল শুয়েছিলেন, তখন কে জানি তাঁকে বলেছিল, "দিদি ! তুমি মায়ের কাছে বললেইত পার, তোমার অসুখ সেরে যাক্।" দিদি বললেন, "মায়ের কাছে বলব আমি ? কেন ? মাকি জানেন না ? মা যেটা ভাল বুঝবেন তিনি সেটা করবেন।" তিনি চাননি বলেতো তিনি বলেছিলেন—

"দুখের বেশে এসেছ তুমি,
তোমায় নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা, সেখানে তোমায়
নিবিড় করি ধরিব হে।।"

আমরা মাথা ধরলে পরে মাথা চেপে ধরি। বুকে ব্যথা হলে বুক চেপে ধরি। অসুখের সময় তিনি তেমনি মাকে চেপে ধরতেন হৃদয়ের মধ্যে। এই ত সাধিকার লক্ষণ আমার মতে। সারা জীবন তিনি বলেছেন যে—

"পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি ছিন্ন পালের কাছি।
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি।"

মা আছেন— "তুমি আছি আর আমি আছি' —এটাই ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় কথা তাঁর। তুমি যখন আছ, আমি নির্ভয়। এটাই ছিল তাঁর জীবনের মূল সুর। কিন্তু শেষের দিকে যদি একটু তাকিয়ে দেখি, আমরা দেখব যে দিদি নিজেকেও যেন পেরিয়ে গেছেন অন্তিম মুহূর্তে। আপনারা স্মরণ করুণ তাঁর শেষ মুহূর্তের কথা। আপনারা জানেন দিদি মহাপ্রয়াণের আগে কিছুদিন অচৈতন্য ছিলেন। মহাপ্রয়াণ করবার খানিকক্ষণ পূর্বে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। চিকিৎসা জগতের বিস্ময়, আমাদের হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাঃ গাঙ্গুলী বলেছেন যে তাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্রে এ জিনিষ কখনো পান নি। হতবাক্ তাঁরা। কি করে এ রোগী চোখ মেলে তাকাতে পারে! দিদি মার ফটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন অনিমেষ দৃষ্টিতে। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সেই দৃষ্টিতে কি কথা ফুটে উঠেছিল?

"দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা সেখানে তোমায় নিবিড় করে ধরিব হে।"

শুধু তা নয়। তার চেয়ে বড় কথা বলে গেলেন দিদি, মৃত্যু তীর্থযাত্রীর শেষ কথা—

"আজ মরণরূপে এসেছ তুমি,
চরণে ধরি মরিব হে।"

এই যে কথা সেইটেই সাধিকার চরম উক্তি, সাধিকার জীবনে সার্থকতম ব্যঞ্জনা আমার মতে। আজ সেই সাধিকা, মাতৃগত প্রাণা, মাতৃবাণীবাহিনী যে দিদি, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার নিবেদন শেষ করছি।

একটি চিঠি

[আশ্রমবাসী সন্ন্যাসিনী স্বামী শান্তানন্দজীকে লেখা দিদি গুরুপ্রিয়ার বিশেষ স্নেহের পাত্রী পুরাতন ভক্ত কুমারী মণির একটি চিঠির অংশ]

সেটা ছিল ১৯৩৭ সালের মার্চ/এপ্রিল। ডাক্তার জে.কে. সেন এর সেই বাগানের মধ্যে একটা গ্রিন হাউস, সেখানে 'মা'কে বসান হয়েছে। মনে আছে তো তাঁদের বাড়ীর চেয়েও বড় বাগান ছিল। আমাদের বাড়ীটা ছিল পাশেই। ছোটবেলা ডাক্তারবাবুর বাড়ী থেকে ফুল চুরি করাটা আমার নিত্য নৈমিত্তিক আনন্দ লাভের পথ ছিল। যাক সে কথা। মা'য়ের গ্রিন হাউস এর সামনেই একটা লাল গোলাপের বাগান ছিল। সেইখানে যুথিকাদির সঙ্গে আমার দেখা হোল। তিনি বললেন, 'এই মণি! ছোড়দিকে প্রণাম কর।' আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে আবিষ্কার করলাম, এক হৃষ্টপুষ্ট, হলদে বস্ত্র পরিহিত, চাদরটি দু ভাগে সামনে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা, কদম ছাট চুল, পিছনে বিশাল টিকি, গায়ের রংটি অতীব উজ্জ্বল, এক ব্রহ্মচারী সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ছোড়দি কই? মা (যুথিকাদি) আবার ধমক দিলেন, 'কই, প্রণাম কর!' বুঝলাম যে এই ভদ্রলোকই 'ছোড়দি।' দিদি একটু হেঁসে বললেন, 'এই বুঝি তোমার মেয়ে?' মিথ্যা

কথা বলব না, আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তখন তো আর জানতুম না যে ওই আপাত কঠিন আবরণের নীচে স্নেহের অগাধ সমুদ্র রয়ে চলেছে।

১৯৭৯ সনে কুরুক্ষেত্রে সংযমের শেষে কালকাজীতে দিদির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম দুই বোন। তুলসী মারফৎ কতই না যত্ন করলেন আমাদের। সব চেয়ে যেটা আশ্চর্য্যজনক আর আমার কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে তা হোল দিদি আমাদের দুই বোনকেই কাছে টেনে মায়ের মত জড়িয়ে ধরে আদর করলেন! ভাবা যায়! চোখের জল আর বাধা মানল না। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। সেই শেষ দেখা।

দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটি বড়ই মধুর ছিল। যথেষ্ট বকুনি খেয়েছি। আমাকে ডাকতেনই বোকা পণ্ডিত বলে। প্রচুর প্রশ্রয়ও দিতেন। এতটা প্রশ্রয়, যে অন্যের ঈর্ষার কারণও হয়েছি মাঝে মধ্যে। যখন মায়ের সঙ্গে আমরা ঘুরতাম, দিদির কাপড় কাচাটা আমারই কাজ ছিল — অবশ্য দিদির instruction এ, কারণ আমার ঐ কাজটি জানা ছিল না। দিদি আহারে বসলেই আমার (আর গিনির, যদি ও থাকত) ডাক পড়ত প্রসাদ পাবার জন্যে। তাই নিয়ে সবাই খুব আমোদ পেত। আমি বলতাম দিদিকে, 'আমি আপনার চেলা হবো।'

দিদির তো সৎসঙ্গে বসার অবসরই হোত না। মায়ের লীলার মধ্যে একটা ছিল, দিদিকে সৎসঙ্গ যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া। দিদিও তা মানতে তৎক্ষণাৎ রাজি। এর পর সুরু হতো আমাদের আমোদ। দিদি তো আর পেছনে গিয়ে বসতে পারেন না। কাজেই একেবারে সামনেই তাঁকে বসতে হোত। দুমিনিটও কাটত না, সুরু হয়ে যেত সর্ব্বদা ক্লান্ত দিদির ঢুলে পড়া। আমরাও ভাষণ শোনা বন্ধ করে দিদিকেই দেখতাম, আর খুব মজা লাগত। মাঝে মাঝে দিদির চোখ খুলে যেত, আর 'মা'ও ঠিক তখনই হয়ত দিদির দিকে চেয়ে আছেন — দিদির অবস্থা তখন শোচনীয়।

কদিন ধরেই দিদির কথা খুব মনে পড়ছে। তাই এত কথা লেখা হয়ে গেল।

অতুলনীয়া দিদি গুরুপ্রিয়া

—গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়

ভারতের অধ্যাত্ম-জগতে অবতার বা মহামানবের আবির্ভাবে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় দ্বৈত বা যুগ্মরূপ। দেব-দেবীর তো কথাই নাই। আমরা সর্বদাই যুগলের উপাসক। তা, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, যা-ই হইনা কেন। হয় গৌরী-শঙ্কর, নয় সীতা-রাম, অথবা রাধা-কৃষ্ণের আমরা উপাসনা করিয়া থাকি। অর্থাৎ শক্তিকে যুক্ত করিয়া এবং তাঁহাকেই প্রথমেই স্থান দিয়া আমরা দেবতার আপন আপন ইষ্টের উপাসনা করিয়া থাকি। পরবর্ত্তী কালেও আমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই গৌর-নিতাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি যুগ্ম পুরুষ রূপের আবির্ভাব এই বঙ্গভূমিতে ঘটিয়াছে। নিতাই বা নিত্যানন্দ না হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কোনও প্রচার বা প্রসার সম্ভবই হইত না। গৌর অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্য নিজে ভাবাবেশেই নিমগ্ন থাকিতেন। বাহিরের দিকে যেন তাঁহার দৃষ্টিই ছিল না। সর্বদা অন্তর্মুখ, কৃষ্ণভাবে বিভোর এবং অন্ত্যলীলায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথধামে যেন সেই জগন্নাথেই বিলীন হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া, স্বরূপে চিনাইয়া দিলেন নিত্যানন্দ এবং তাঁহাকে

অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন তিনিই। তাই 'সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ যুগধর্মপালৌ' রূপে গৌর-নিতাই অভিন্নরূপে বন্দিত হইয়া আসিতেছেন। তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধিতেই নিমগ্ন থাকিতেন। মা-মা নামে বিভোর, "মা বিনা যে কিছু জানেনি আর।" 'নরেন শিক্ষে দিবে' এই বলিয়া তাঁহাকে চিনাইবার শিক্ষা দিবার ভার তিনি অর্পণ করিয়া গেলেন তাঁহার আদরের নরেনকে অর্থাৎ পূর্বাশ্রমে নরেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দকে। এখন সর্বত্রই এক নি:শ্বাসে এই দুইটি নাম উচ্চারিত হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

কিন্তু দুইটি মহীয়সী নারীর যুগ্ম আবির্ভাবের কথা কোনদিন কোথাও শোনা যায় নাই ইতিপূর্বে। জগজ্জননী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের পিছন পিছনই যেন আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রী গুরুপ্রিয়া দেবী, তাঁহার অভিন্ন সহচরী ও সেবিকারূপে। শ্রীশ্রী মায়ের শতবার্ষিকী কিছুদিন পূর্বেই সারা দেশ জুড়িয়া মহা সমারোহে পালিত ও উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই বৎসর শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর। যিনি সকলের কাছে শুধু 'দিদি' বা তাঁর ডাক নামে 'খুকুনী দিদি' বলিয়া পরিচিত। তাঁহার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইতে চলিয়াছে। মা'র সঙ্গে এক নি:শ্বাসে এই দিদি নামটিও উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। যেখানে মা সেখানেই দিদি। স্বয়ং মা-ও তাঁহাকে প্রকাশ্যে 'দিদি' বলিয়াই ডাকিতেন অনেক সময়ে অর্থাৎ তিনি

সকলেরই যেন দিদি, যেমন মা সকলেরই মা। ছায়ার মতো সদা সর্বদা মায়ের অনুগামিনী, একান্ত পরিচারিনী, সেবাকর্মে সতত নিয়োজিনী এই দিদি যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে কোথায় বা কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইত শ্রীশ্রী মায়ের এত আশ্রম। শ্রীশ্রী মায়েরই ভাবাদর্শে শিক্ষিত করিয়া তুলিত, কে-ই বা স্থাপন করিত শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ ?

অনন্য সাধারণ কে এই দিদি ? তাঁকে প্রথম দেখি ঢাকার নবাবদের বাগান বাড়ীতে শাহবাগে, যখন সেখানে আমার পূজনীয় পিতৃদেব ৺প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় ও পূজনীয়া মাতৃদেবী ৺সুরবালা দেবীর সঙ্গে এক আশ্চর্য্য অলৌকিক কুলবধূ নির্মলা সুন্দরীকে দেখিতে যাই তাঁহার স্বামী ৺রমনীমোহন চক্রবর্তীর বাসস্থানে। সেটা ১৯২৩/২৪ সাল, বয়স তখন আমার চার বা পাঁচ। নবাবদের ঐ বাগান বাড়ীর সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট রূপে তখন রমনীবাবু নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ বাগানের মধ্যেই রমনীয় শান্ত পরিবেশের মধ্যে রমনীবাবুর জন্য কোয়াটার্স বাসা নির্দিষ্ট ছিল। বাহিরের লোকজনের সেখানে বিশেষ গতাগতি ছিল না। শান্ত পরিবেশে বাস করিয়াও রমনীবাবু বড় অশান্তভাবে তখন দিন কাটাইতেছেন। গৃহে তখন তাঁহার বড় অশান্তি। অশান্তি তাঁহার সহধর্মিনী অসূর্য্যম্পশ্যা অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাপটাবৃতা নির্মলাসুন্দরীকে লইয়া।

অসাধারণ রূপবতী ও গুণবতী, স্বামীর একান্ত অনুগতা এই সহধর্মিনীর একটিই দোষ: হরিনামে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না, সংজ্ঞা হারান। যখন-তখন যেখানে-সেখানে তাঁহার স্বাভাবিক স্থিতি বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। হয় তো রন্ধন করিতে করিতেই হাত হইতে বাসন পত্র পড়িয়া যায়। কোনদিন অগ্নিদগ্ধ হইয়াই না মারা যান। এইরূপ নানা আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় আপন সহধর্মিনীকে লইয়া তাই রমনীবাবুর চিন্তা ও অশান্তির সীমা নাই।

ঠিক এই সময় আকস্মিকভাবে আমার পূজনীয় পিতৃদেবের সঙ্গে একদিন রমনীবাবুর যোগাযোগ ঘটিয়া যায় পিতৃদেবেরই এক বন্ধু, রমনা রেসকোর্সে নিত্য প্রাতভ্রমনের সঙ্গী অধ্যাপক ননীবাবুর মাধ্যমে। তখন শাহবাগে ননীবাবু ও পিতৃদেব ও তাহার কিছু পরে বাউলচন্দ্র নামে আর একজন ভদ্রলোক, এই তিনজনের গতাগতি আরম্ভ হয়। ইহার কিছুদিন পরে ঢাকার তদানীন্তন সিভিল সার্জন ডাক্তার শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় আমার ৺পিতৃদেবের মারফৎ এই দিব্য অলৌকিক ভাবময়ী জননী নির্মলার সন্ধান পাইয়া তাঁহার দর্শনের জন্য শাহবাগে যান এবং তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। কিছুদিন পরে শশাঙ্কবাবু তাঁহার কন্যা আদরিণীকেও এই মায়ের কাছে লইয়া যান এবং সেই প্রথম দর্শনের দিন হইতেই যেন তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ আবার নূতন করিয়া স্থাপিত হইয়া যায়। ইহা সবই এখন প্রায় প্রাগৈতিহাসিক

ঘটনা। পরবর্তী কালে সেই নির্মলাসুন্দরী জগজ্জননী মাতা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী রূপে আত্মপ্রকাশ এক অভিনব যুগান্তকারী ইতিহাস। সেই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সেবিকারূপে শশাঙ্কমোহনের কন্যা আদরিণীর ব্রহ্মচারিনী গুরুপ্রিয়ারূপে উত্তরণও আর এক ইতিহাস।

ভবরোগনিবারিনীরূপে আনন্দময়ীর আবির্ভাবের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে উল্লেখ করিলাম এই কারণে যে বিশিষ্ট চিকিৎসক শশাঙ্কমোহনও যেমন সব ছাড়িয়া সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দরূপে পরিচিত হইলেন ঠিক তেমনি তাঁহার আদরিণী কন্যাটিও যেন ডাক্তারের সঙ্গে নার্সরূপে নিত্য সেবিকারূপে মায়ের চরণে অর্পিতা হইয়া গেলেন। মা তাঁহাকে পৈতা দিলেন, ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিলেন এবং গুরুপ্রিয়া নামে অলঙ্কৃত করিলেন।

ঢাকা ছাড়িয়া সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করিবার জন্য ইহার পরই মায়ের অশ্রান্ত পরিক্রমা আরম্ভ হইল স্থান হইতে স্থানান্তরে, তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে। পূর্ববঙ্গের এক প্রান্ত হইতে সুদূর হিমালয়ের পাদদেশে দেরাদুনে গিয়া তিনি উপনীত হইলেন। ইহার পূর্বে অবশ্য আমার পিতৃদেবের একান্ত অনুরোধে তিনি ১৯২৬ সালে বৈদ্যনাথ ধামে দেওঘরে আমাদের বাসায়

পদার্পণ করেন ও কয়েকদিন অবস্থান করেন। আমার পিতৃদেব চাহিয়াছিলেন জগজ্জননীরূপে যাঁহাকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ঢাকায় তাঁহার কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে, তাঁহার সেই আবিষ্কার অভ্রান্ত কিনা তাহা নিজের গুরুদেব যোগীরাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজিকে দিয়া যাচাই করিয়া লইতে। তাই রমনীবাবু তাঁহার সহধর্মিনীকে লইয়া আমাদের কাছে আসিয়া উঠিলেন এবং সহধর্মিনী ছাড়া আর একজনও তাঁহারই মতো লালপাড় সাড়ী পরা ভদ্রমহিলাকে দেখিলাম। শুনিলাম, তিনি শশাঙ্কবাবু ডাক্তারের কন্যা মাকে দেখাশোনা করেন এবং তাই সঙ্গে আসিয়াছেন। সেই আমার দিদিকে প্রথম অন্তরঙ্গভাবে দেখা ও চেনা। বয়স আমার তখন আট বৎসর।

বালক আমি সেইদিন হইতেই তাঁহাদের দুইজনের অপরিসীম স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া আজীবন ধন্য হইয়াছি। দুজনেই তাঁহাদের বাৎসল্যে আমাকে আপন সন্তানের মতই সর্বদা নিজেদের কোলে স্থান দিয়াছেন। চুল আঁচড়াইয়া দিয়াছেন। খাওয়াইয়া দিয়াছেন আপন হাতে। ইহার অনেক পরে ১৯৪৪/৪৫ সালে যখন কাশীতে সবে মায়ের আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে তখন দিনের পর দিন মায়ের পাশে বসাইয়া এই দিদি তাঁহার স্বহস্তের সেই অমৃতময় সুস্বাদু নানা অন্নব্যঞ্জন যেমন মায়ের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পরিবেশন করিয়াছেন। সে-সব অতুলনীয় স্নেহের কথা কি

কখনও ভুলিবার ? পাশে বসিয়া আমি হয় তো একটা ব্যঞ্জন মাখিয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলিয়াছি মা অমনি কৌতুক করিয়া দিদিকে বলিলেন, "ও যেমন করে খেলো আমাকে তেমনি করে ঐটা দিয়ে মেখে খাইয়ে দে।"

মাকে খাওয়ানো, শোয়ানো, স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘোরানোর সমস্ত ভার এই দিদির। অবাক হইয়া কেবল ভাবিতাম, একটি মানুষের পক্ষে এত কাজ এমন নিখুঁত করিয়া সুসম্পন্ন করা কি করিয়া সম্ভব হয় ? এমন অপরিসীম শক্তির অধিকারিণী তিনি হইলেন কোন সাধনায় ? সে সাধনা ছিল তাঁহার একটি মাত্র, মায়ের প্রীতিসাধন। মা কী করিলে প্রীত হইবেন, মাকে কি ভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবেন, দিদির সর্বক্ষণ এই একমাত্র চিন্তা, ধ্যান-জ্ঞান।। ইহাই ছিল তাঁহার নিত্য পূজা, আরাধনা। ব্রহ্মচারিণীর নিত্য ক্রিয়াকর্ম যেমন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতেন সেই অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা সমাধা করিয়া যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতেন মাতৃসেবায়। মায়ের জন্য রন্ধনের সমস্ত আয়োজন করা, নিজে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন অন্নাদি রন্ধন করা, অতি শুদ্ধাচারে স্বহস্তে মা'কে প্রতিদিন খাওয়াইয়া দেওয়া। মা আপন দেহকে রক্ষা করার জন্য স্বহস্তে কিছুই মুখে তোলেন না। দিদি সযত্নে তাঁহার মুখে সব একে একে তুলিয়া দিয়া তাঁহার দেহটিকে সযত্নে সর্বদা পোষণ-পালন করেন। সেখানে যেন তিনি মার স্নেহময়ী জননীর ভূমিকা

পালন করিয়া গিয়াছেন দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বৎসরের পর বৎসর। কোনও শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই। অনুযোগ-অভিযোগ নাই। মাতৃসেবার যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়।

তখন পরমানন্দ স্বামিজীও আসেন নাই। দিদিই এক হাতে মায়ের সব সেবা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নানা জায়গায় মায়ের জন্য যত আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির তদারক, অর্থের জোগান দেওয়া, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা, সব নিজেই করিয়াছেন। কোনো পুরুষেরও এমন শক্তি-সামর্থ্য দেখি নাই, অবলা নারীর তো কথাই নাই। দিদি যেন দশভুজা হইয়া দশ হস্তে কাজ করিতেন। মায়ের জন্য রান্নাবান্না করিতেছেন। আবার সেই সঙ্গে ফাঁকে ফাঁকে যখনই যেটুকু অবসর পাইতেছেন মা যেখানে ভক্তদের লইয়া সৎসঙ্গ করিতেছেন সেখানে আসিয়া তাঁহার শ্রীমুখের অমৃতময়ী কথা, নানা উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার লেখা সেই সব দিনলিপি এক অমূল্য সম্পদ হইয়া রহিয়াছে, যাহা তিনি আমাদের সকলের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এক হাতে রাঁধিতেছেন, আর এক হাতে লিখিতেছেন, আবার চিঠিপত্রের সব উত্তরও তিনিই লিখিয়া পাঠাইতেন প্রথম দিকে, অন্য কেহ তখন সাহায্য করার ছিল না।

এ ছাড়া বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, যিনি মাতৃদর্শনে

আসিতেছেন, তা উচ্চ কোটির সাধু-মহাত্মাই হোক বা বিশিষ্ট রাজপুরুষ, রাজা-মহারাজা, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল, তাঁহার পত্নী কমলা, কন্যা ইন্দিরা, যিনিই হোন, সকলের যথাযথ মর্য্যাদানুরূপ আদর-আপ্যায়ন, সৎকার, পরিচর্য্যা নিখুঁতভাবে সম্পাদন সব ভার দিদির উপর।

দিদির সব চেয়ে বড় কাজ মা'কে নানা জায়গায় নিজের আশ্রমে সুস্থিত করা। আগে মা যখনই যেখানে যাইতেন আশ্রয় নিতেন কোন মন্দিরে বা ধর্মশালায়। কলকাতায় প্রথম দিকে তাঁহার দর্শন মিলিত বিরলাদের প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট নানা মন্দিরে, দেওঘরে গেলে তিনি উঠিতেন কখনও নির্বাণ মঠে বা আমাদের গুরুদেবের আশ্রমে। কৃষ্ণনগরে একবার তিনি এলেন, শুনিলাম উঠিয়াছেন থাকিবার সংকীর্ণ পরিসরের মন্দির সংলগ্ন আশ্রমে। ছুটিলাম সেখানে তাঁহার দর্শন-লালসায়। সর্বত্রই প্রায় এইরকম চলিত তখনকার দিনে। দিদিই তাঁহাকে নিজস্ব আশ্রমে একটি সুবন্দোবস্তের মধ্যে যাহাতে ভক্তবৃন্দ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন এবং সৎসঙ্গ সদুপদেশ লাভ করিতে পারেন তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন। মা অবশ্য সর্বদাই বাধা-বন্ধনহীন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কাছে অন্যের মন্দির, বা সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মশালাও যেমন, নিজের নামাঙ্কিত আশ্রমও তেমন। শেষের দিকে দেখিয়াছি কাশীর আশ্রমে

আসা-যাওয়ার সময় তাঁহার সেই ভুবন ভোলানো হাসিমাখা মুখে বলিতেন, 'এ তো খুকুনী আশ্রম করিয়াছে। এ শরীরটা পাখির মতো দুই দিন এখানে থাকিল। এখন আবার উড়িয়া অন্যত্র চলিল।' সুতরাং মায়ের কাছে এই সব আশ্রম স্থাপনে কোনও ইতরাবিশেষ না হইলেও ভক্ত অনুরাগীবৃন্দের পক্ষে তাঁহাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সুব্যবস্থার মধ্যে পাওয়ার যে দুর্লভ সুযোগ দিদি করিয়া দিলেন, তাহার তুলনা নাই। এক দিদি ছাড়া এই চির-চঞ্চল পাখীটিকে এভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ করার ক্ষমতা আর কাহারই বা ছিল ?

সর্বশেষে স্মরণ করিতে হয় দিদির অতুলনীয় অবদান ও কীর্তি কাশীর আশ্রমে কন্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা। মায়ের আদর্শে মেয়েরা আপন-আপন জীবন গঠন করিবার সুযোগ যাহাতে লাভ করিতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া দিদি এই কন্যাপীঠ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। কন্যারা ব্রহ্মচারিনীরূপে আশ্রমে বাস করিবে। প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারায় সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা লাভ করিবে। তাহারই সমস্ত সুব্যবস্থা তিনি করিলেন। অর্থের কোন সংস্থান তেমন নাই। শুধু থাকিবার স্থানটুকু আশ্রম দিতে পারে। তাই সমস্ত ভক্তবৃন্দের কাছে আবেদন করিয়া দিদি অর্থ সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হইলেন। আমার গর্ভধারিনী জননীকে তিনি মাসিমা বলিতেন। তাঁহার কাছেও তিনি এই কাজে সাহায্য চাহিলেন। আমার স্মরণে আছে আমার মা যতদিন দেহে ছিলেন

প্রতিমাসের প্রারম্ভে মনিঅর্ডারে তাঁহার যৎসামান্য দান সর্বাগ্রে দিদির কাছে পাঠাইয়া দিতেন। এইভাবে সকলের কাছে মাধুকরী করিয়া তিলে তিলে দিদি এই অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

আজ এই কন্যাপীঠটি সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। আশ্রম তো ভারতবর্ষে অনেকই আছে। কিন্তু শুধু মেয়েদের জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান আর দ্বিতীয় আছে বলিয়া আমার জানা নাই। নারী-মুক্তি বা নারী-শিক্ষার নানা গালভরা কথা আমরা সব সময় বলিয়া থাকি। কিন্তু নারীদের জন্য, আমাদের মায়েদের জন্য, যথার্থ কিছু কাজ করিতে কেহই তেমন অগ্রণী হন না। আধ্যাত্মিক ভাবে নারীদের ভাবিত করার কথা তো একেবারেই কেহ ভাবেন না। অথচ সমাজের জাতির সব কিছু পরিবর্তন নির্ভর করিতেছে নারীজাতির অবদানের উপর। তাহাদের যথার্থ শিক্ষা দিয়া উন্নত করার উপর। দিদির যে কত দূর-দৃষ্টি ছিল এবং কত বড় কাজ তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাপ আজ কে করিবে?

এই প্রসঙ্গে মনে জাগে জননী শ্রীশ্রী সারদা দেবী ও ভগিনী নিবেদিতার কথা। ঠিক তেমনই একটি আদর্শ জুটি হইলেন শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ও দিদি গুরুপ্রিয়া। প্রেরণা উভয় ক্ষেত্রেই দিয়াছেন মা আর তাঁহার ভাবধারাকে কার্যে

রূপদান করিয়াছেন এক ক্ষেত্রে নিবেদিতা অন্য ক্ষেত্রে গুরুপ্রিয়া। তাও তো নিবেদিতা এক বিদেশিনী। যিনি নিজের জীবনকে নিবেদন বা উৎসর্গ করিয়াছিলেন ভারতমাতার চরণে। স্বামী বিবেকানন্দ এ দেশের তেমন কোন নারীকে শিষ্যরূপে লাভ করেন নাই যিনি তাঁহার আদর্শকে রূপায়িত করিতে পারেন। আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে আমরা একজন ভারতীয় বাঙালী ঘরের মেয়ের মধ্যে এমন অদম্য কর্মশক্তি, আদর্শ জীবনগঠনের পরিকল্পনা ও রূপদান প্রত্যক্ষ করিলাম। তাঁহার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেই মহাজীবন হইতে সকলে, বিশেষ করিয়া মেয়েরা ও মায়েরা, যদি প্রেরণা লাভ করেন, তাহা হইলেই এই উৎসব পালনের সার্থকতা। আশাকরি আমরা সকলে সে বিষয়ে সচেষ্ট হইব।

মনে পড়ে আর একজন বিদেশীর কথা। যিনি বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন ও লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাম ছিল ডাক্তার আলেকজাণ্ডার। পরে তিনি তাঁহার গুরু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কাছে (যিনি নিজেও একজন বিদেশী সাহেব) বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধু হরিদাস রূপে পরিচিত হ'ন। সেই হরিদাস একবার নয় বহুবার আমাকে বলিয়াছেন, 'আনন্দময়ী মা আর এমন কী, আসল লোক হইলেন ঐ দিদি, এমনটি আর দেখা যায় না।' তখন ভাবিতাম তিনি মাকে চিনিতে পারেন নাই। এখন মনে হয় আমরা তেমনি দিদিকে চিনিতে পারি নাই। যিনি মায়ের

মধ্যে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সাহেব সাধুটি তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া যথার্থই তাঁহাকে স্বরূপত: চিনিয়াছিলেন।

আমার কাছে দিদির একটি মূর্তিই সর্বদা হৃদয়ে জাগিয়া আছে, সেটি তাঁহার অপার স্নেহের মূর্তি। মনে পড়ে কাশীতে আমি তখন পাঁড়ে ঘাটে গঙ্গাতীরে একটি ছোট ঘরে থাকি। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করি। হঠাৎ একদিন সকালে মায়ের আশ্রম হইতে একজন আসিয়া দিদির লেখা একটি ছোট দুই ছত্রের পত্র দিয়া গেল। 'গোবিন্দ ভাই। আজ তোমার আশ্রমে কচুবাটা খাওয়ার নেমন্তন্ন। ইতি তোমার দিদি।' সামান্য কচুবাটা যে এমন সুস্বাদু হইতে পারে জানা ছিল না। স্বপ্নেও ভাবি নাই। দিদির হাতের গুণে এবং স্নেহরসের সিঞ্চনে সেদিন মায়ের সঙ্গে বসিয়া একত্রে সেই কচুবাটা আস্বাদনের অমৃতময় অভিজ্ঞতা এখনও আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছাদন করিয়া আছে।

দিদির সম্বন্ধে বলিয়া বা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কেই বা মাকে পাইত, কোথায় বা থাকিত আশ্রম, যদি দিদি না থাকিতেন। তাই মায়ের জন্যই যেন দিদির আবির্ভাব। দিদির জন্য মায়ের। তাঁহাদের অভিন্ন এই যুগল-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে আমার শত সহস্র বিনম্র প্রণাম।

দেখিতেছি ভাবে এত ভরপুর যে চোখও ভাল খুলিতে পারিতেছেন না। আমি ত এই প্রকার ভাব আর কখনও চক্ষে দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি, আর কেমন মনে হইতেছে যাহা চাহিতে ছিলাম আজ যেন তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি।

—দিদি গুরুপ্রিয়া